# অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রান্তিক মানুষ ও তাদের জীবনধারা

যশোরে স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত ৫টি সিরিজ প্রতিবেদন
১৫ আগস্ট ২০২৪ - ১৪ নভেম্বর ২০২৪

# অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রান্তিক মানুষ ও তাদের জীবনধারা

যশোরে স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত ৫টি সিরিজ প্রতিবেদন

১৫ আগস্ট ২০২৪ - ১৪ নভেম্বর ২০২৪


অর্থায়নে

Funded by
the European Union

পরিচালনায়

FREE PRESS UNLIMITED

ARTICLE 19

বাস্তবায়নে

SOUTH ASIA CENTER FOR media in development

গ্রামের কাগজ

**অর্থায়নে**

Funded by
the European Union

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

**প্রকাশক**

সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (সাকমিড)
বাড়ি # ৪/২ (৩য় তলা), ইকবাল রোড, ব্লক এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৯০১, +৮৮ ০২ ৪১০২২৯০২, +৮৮ ০১৮১৯১২৯৪৭৩
ইমেইল: info@sacmid.asia, dd.sacmid@gmail.com
www.sacmid.asia

**প্রকাশের সময়ঃ** ডিসেম্বর ২০২৪

**সম্পাদনা ও পরিমার্জনা**

মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ কামরুল হাসান, উপ-পরিচালক, সাকমিড

**সম্পাদনা সহযোগী**

মোঃ শাহিনুর ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, সাকমিড

আবু সুফিয়ান, প্রোগ্রাম অফিসার, সাকমিড

**কপিরাইট**

সব অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশ কোনভাবে, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক মাধ্যমসহ, প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনঃপ্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না।

**প্রচ্ছদ, লেআউট ও ইনার ডিজাইন**
শাদমান আল আরবী

# সূচিপত্র


ফেলোশিপ প্রদানের ধাপসমূহ

| | |
|---|---|
| আবেদন আহ্বান ও বাছাই প্রক্রিয়া | ০১ |
| মেন্টর ও দিকনির্দেশনা প্রদান | ০২ |
| অর্থ সহযোগিতা প্রদান | ০২ |
| প্রতিবেদন জমাদান ও সম্পাদনা | ০২ |
| সংবাদপত্রে প্রকাশ | ০৩ |

পাঁচটি গ্রুপের প্রতিবেদনসমূহ

| | |
|---|---|
| গ্রুপ ১: ডাক্তার তৈরির কারখানা যশোর | ০৪ |
| গ্রুপ ২: জেলেরা পান না জলের অধিকার | ২০ |
| গ্রুপ ৩: যশোরে বৈচিত্রময় আয়ে নারী | ৩৭ |
| গ্রুপ ৪: সীমান্তে মানব পাচার | ৬১ |
| গ্রুপ ৫: ভবদহে জলাবদ্ধদের মানসিক স্বাস্থ্য সমাচার | ৮৩ |

| | |
|---|---|
| ফেলোশিপের প্রভাব ও অভিজ্ঞতা | ১০৮ |
| প্রতিবেদনের বাছাই ছবি | ১১০ |
| যশোর জেলার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কাজের অঞ্চলসমূহ | ১১২ |

# অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রান্তিক মানুষ ও তাদের জীবনধারা

সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট

## ফেলোশিপ প্রদানের ধাপসমূহ

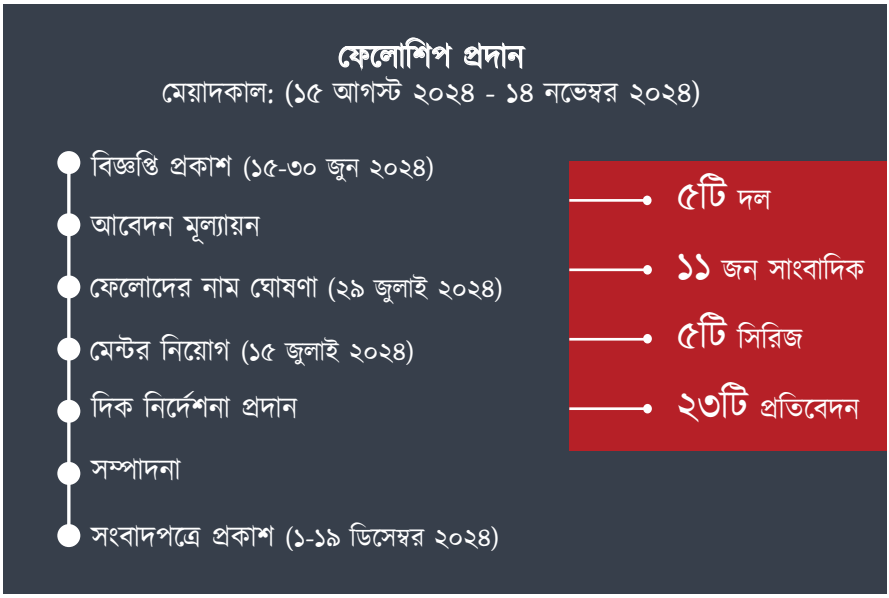


## ফেলোশিপ-এর জন্য আবেদন আহ্বান ও ফেলো বাছাইকরণ

প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী, যশোরের সাংবাদিকদের জন্য সাকমিড অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক তিন মাসব্যাপী ফেলোশিপ প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রথমে, ফেলোশিপ প্রদানের জন্য ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রচারণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বমোট ৮টি দল আবেদন করে। পরবর্তীতে আবেদনকারী দলগুলো থেকে ৫টি দলকে বাছাই করা হয়। বাছাইপর্বের প্রথম ধাপে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের লিখিত প্রস্তাবনার প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্ভুক্তিসহ মোট ৫টি মানদণ্ড ৭০ নম্বর যাচাই ও পরবর্তী ধাপে অনলাইনে মৌখিক পরীক্ষা (৩০ নম্বর) গ্রহণ করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে উক্ত বিষয় বিবেচনায় মোট ৩ জন বিশেষজ্ঞ এই ৫টি দলকে চূড়ান্ত করলে ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে সাকমিড এই ফলাফল ঘোষণা করে। ৫টি দলে সর্বমোট ১১ জন সাংবাদিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ফেলো হিসেবে চুড়ান্তভাবে মনোনীত হন।

## ফেলোদের সঙ্গে সাকমিডের আনুষ্ঠানিক চুক্তি

সাকমিড ফেলোশিপের জন্য মনোনীত সাংবাদিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ১৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে ফেলোশিপের কার্যক্রম শুরু করে। ফেলোদের প্রত্যেক দল থেকে একজনের নেতৃত্বে ও প্রত্যেকের স্বাক্ষর সম্বলিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

## দিকনির্দেশনার জন্য মেন্টর নিযুক্তকরণ

ফেলোদের তিন মাসব্যাপী দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতীয় পর্যায়ের একজন সাংবাদিককে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে তাকে নিযুক্ত করা হলে তিনি ফেলোশিপপ্রাপ্ত সাংবাদিকদেরকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সম্পাদনা ও প্রতিবেদন লিখনসহ সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের কাজ শুরু করেন।

## অর্থ সহযোগিতা প্রদান

ফেলোশিপ এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ঘোষণা অনুযায়ী, এর আওতায় ফেলোদেরকে অর্থ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে সাকমিড এর সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর, খসড়া প্রতিবেদন জমাদান এবং ফেলোশিপের সমাপ্তি - মোট তিনটি ধাপে ফেলোদেরকে ব্যাংক মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থ প্রদান করা হয়।

## প্রতিবেদন জমাদান ও সম্পাদনা

ফেলোশিপপ্রাপ্ত ৫টি দল সাকমিডকে মোট ৫টি বিষয়ে (প্রত্যেকটির জন্য ৪-৫টি করে) সর্বমোট ২৪ টি প্রতিবেদন জমা দেয়। ফেলোশিপের জন্য নিযুক্ত মেন্টর এই প্রতিবেদনগুলো সম্পাদনা করে সংবাদপত্রে ছাপানোর উপযোগী করে তোলেন।

## সংবাদপত্রে প্রকাশ

প্রতিবেদনগুলোকে সংবাদপত্রে ছাপানোর জন্য আরো উপযোগী করে তোলার পর ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত যশোরের দুইটি স্থানীয় সংবাদপত্র দৈনিক গ্রামের কাগজ-এ ১৯ টি এবং দৈনিক রানার-এ ৫টি প্রতিবেদন সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হয়। এর আগে, পত্রিকা দুইটিতে প্রতিবেদনগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে উল্লেখ করে যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর ২০২৪ দুটি ঘোষণা প্রকাশ করা হয়।

## সেরা প্রতিবেদন বাছাই

### মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

সেরা প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে নিজ দলের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সাংবাদিক ফয়সল ইসলাম

ক্রেস্ট হাতে সেরা ও বিশেষ প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে বিজয়ী

বিশেষ প্রতিবেদন-১ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সাংবাদিক আসাদ আসাদুজ্জামান

## সংবাদপত্রে প্রকাশ

প্রতিবেদনগুলো সংবাদপত্রে ছাপানোর পর সেগুলোতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি, তাদের দাবি ও অধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান, উপস্থাপনার উৎকর্ষ, সৃজনশীলতা ইত্যাদি বেশকিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মূল্যায়ন করা হয়। একজন সাংবাদিক, একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক- এই প্রতিবেদনগুলো মূল্যায়ন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সেরা প্রতিবেদনের জন্য ফয়সল ইসলাম, আশিকুর রহমান শিমুল ও মহিউদ্দীন সানি, ২য় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশেষ প্রতিবেদন-১-এর জন্য আসাদ আসাদুজ্জামান ও জাহিদ আহমেদ লিটন এবং ৩য় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সেরা প্রতিবেদন-২-এর জন্য প্রণব কুমার দাস ও সোহরাব হোসেন পুরস্কার জিতেছেন। তাদেরকে এই অর্জনের জন্য দলীয়ভাবে ক্রেস্ট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪-এ যশোরের একটি হোটেলের সম্মেলন কক্ষে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রত্যেক ফেলোকে সাকমিড, আর্টিকেল ১৯ ও ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড-এর পক্ষ থেকে যৌথ স্বাক্ষরিত সনদপত্র প্রদান করা হয়। সেরা প্রতিবেদনগুলি কিছুটা পরিমার্জনার পর গ্রন্থাকারে পাঠক সমীপে তুলে ধরা হোল ।

গ্রুপ-১

# ডাক্তার তৈরির কারখানা যশোর

ফয়সল ইসলাম ও আশিকুর রহমান শিমুল

# লেখক পরিচিতি

## ফয়সল ইসলাম

ফয়সল ইসলাম ২০০৪ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন যশোরের দৈনিক আমার জমিন পত্রিকায়। বর্তমানে তিনি দৈনিক গ্রামের কাগজ-এর সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রধান। স্বাস্থ্যসেবা, স্থানীয় সমস্যা ও সামাজিক ইস্যুতে নিবিড়ভাবে কাজ করেন। প্রেস ইনস্টিটিউট, এমআরডিআই, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এমআরডিআই ফেলোশিপ, দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যম অ্যাওয়ার্ড, তথ্য কমিশন ও টিআইবি পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা পেয়েছেন। ২০২৪ সালে সাকমিড ফেলোশিপ ও সেরা প্রতিবেদক পুরস্কার অর্জন করেন। নিষ্ঠা ও দক্ষতায় তিনি পাঠকদের মাঝে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন।

## আশিকুর রহমান শিমুল

আশিকুর রহমান শিমুল ২০১৪ সালে দৈনিক গ্রামের কাগজে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন। স্বীয় দক্ষতা ও পরিশ্রমের ফলে ২০১৬ সালে পদোন্নতি পান। ২০২০ সাল থেকে পত্রিকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও কাজ করছেন। প্রায় এক যুগের সাংবাদিকতা ক্যারিয়ারে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট, এমআরডিআই, বিবিসি ও সাকমিড থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, বিশেষত অনুসন্ধানী ও ডেটা সাংবাদিকতায়। ২০২৪ সালে সাকমিড ফেলোশিপ ও সেরা প্রতিবেদক (যৌথভাবে) পুরস্কার অর্জন করেন। তথ্য অধিকার, জনস্বার্থ সাংবাদিকতা ও ডিজিটাল কনটেন্ট প্রযোজনায়ও তিনি প্রশিক্ষিত, যা তার পেশাগত দক্ষতা আরও সমৃদ্ধ করেছে।

## মহিউদ্দিন সানি

গণমানুষের পক্ষে কথা বলার ইচ্ছে থেকেই মহিউদ্দিন সানি লেখালেখি শুরু করেন। অল্প বয়সেই সাংবাদিকতাকে বেছে নিয়েছেন পেশা হিসেবে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে কখনও অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের গল্প তুলে ধরেছেন তো কখনও ধরে রেখেছেন শহর বা শহরের বাইরের হার না মানা মানুষের জিতে যাওয়ার ইতিহাস। এ পেশায় এসে বহু অসহায় পরিবার বা নারী-শিশুদের দুর্দশার কথা জানতে পেরেছেন। তা জানিয়েছেন তার পাঠকদের কাছে। এর ফলে অনেকেরই ভাগ্য বদলেছে। অদম্য মেধাবীদের কেউ হয়েছে ডাক্তার কেউবা শ্রমজীবন থেকে ফিরেছে লেখাপড়ায়। কখনো বা উদ্যোক্তাদের ভাগ্য ফিরেছে। বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে ফেলা বেশ কয়েকটি পরিবার পেয়েছে নতুন দিশা। দৈনিক গ্রামের কাগজে সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি গণমানুষের পক্ষে সরব রয়েছেন।

ডাক্তার তৈরির কারখানা যশোর

পর্ব: ০১

# ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সনদ কিনে ডাক্তার,নার্স!

## অল্প টাকায় সনদ, বছরে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য 'ডাক্তার'

সরকারি অনুমোদন নেই, স্বীকৃত কোনো ডিগ্রিও নেই, আবার চিকিৎসা সম্পর্কেও নেই সঠিক জানাশোনা। অথচ সামান্য টাকা খরচ করেই বনে যাচ্ছেন 'ডাক্তার'। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে গিয়ে একদিকে যেমন প্রতারিত হচ্ছেন, তেমনি অপচিকিৎসার শিকার হয়ে পড়ছেন জীবন ঝুঁকিতে। এরকম ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও প্যাথলজিস্ট তৈরির অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালাচ্ছে যশোরে। স্থানীয় মানুষ মজা করে এগুলোর নাম দিয়েছে 'মিনি মেডিকেল কলেজ'। কেউ কেউ এগুলোকে ডাক্তার তৈরির কারখানাও বলে থাকেন। মূলত সনদ বিক্রিই ওইসব প্রতিষ্ঠানের কাজ।

বহুল আলোচিত এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক্তার পদবি ব্যবহারের জন্য সার্টিফিকেট কিনতে লাগে মাত্র ১০ হাজার টাকা। আর ডেন্টিস্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও প্যাথলজিস্ট হতে খরচ হয় মাত্র তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। এসবের জন্য লাগে না কোনো প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষা। টাকা দিলেই মিলে যায় সার্টিফিকেট। আবার টাকার পরিমাণের কমবেশিতে 'ভালো রেজাল্ট' বা 'খুবই ভালো রেজাল্টের' ফর্মূলাও রয়েছে। যারা এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই আবার অন্য পেশার মানুষ। ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী বলে কেউ কেউ পরিচয় দিলেও খুঁজে পাওয়া যায়নি কর্মস্থলের ঠিকানা। যশোর জেলা জুড়ে নামে বেনামে গড়ে ওঠা এসব প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার বাধাবিঘ্ন ছাড়াই চলছে। গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানে এমন সব তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

## ১৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা

অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে যশোর শহর ও এর আশপাশে ১৬টি ডাক্তার তৈরির কারখানা তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর মধ্যে শহরসহ সদর উপজেলায় রয়েছে পাঁচটি, কেশবপুরে দু'টি, চৌগাছায় একটি, মণিরামপুরে চারটি, শার্শায় দু'টি, অভয়নগরে একটি ও ঝিকরগাছায় একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতারণার শীর্ষে এবং বহুল আলোচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ডালিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, রাইজিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন, মধুমতি মেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন ও প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। তারা ব্যবহার করছে বগুড়া, সাতক্ষীরা, যশোরের কেশবপুর, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন ভুঁইফোঁড় সংগঠন বা ফাউন্ডেশনের দেয়া নিবন্ধন নম্বর ও কলেজ কোড।

## কী পড়ানো হয়, কারা ক্লাস নেয়

যশোর শহরের পুরাতন কসবা ঢাকা রোডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালাচ্ছে ডালিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি নামে একটি প্রতিষ্ঠান। তারা কোর্স করাচ্ছে চারবছর মেয়াদি ম্যাটস, নার্সিং, ডেন্টাল, প্যাথলজি, ডিএমএফ, ডিএমএ, ডিএমএস, পল্লী চিকিৎসক, জুনিয়র নার্সিং ও ডিপ্লোমা নার্সিং কেয়ার গিভারস্ -সংক্রান্ত কোর্স। অথচ তাদের এ প্রতিষ্ঠানের কোনো অনুমোদনই নেই। এমনকি একটি ট্রেড লাইসেন্সের কাগজও দেখাতে পারেননি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোজাইদুল ইসলাম। তিনি জানান, 'ডালিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি' নামে প্রতিষ্ঠানের কোনো অনুমোদন নেই সত্যি। তারা বগুড়া থেকে পরিচালিত 'সিট ফাউন্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদন নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন। শিক্ষার্থীরা যশোরে পড়াশোনা করলেও তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয় বগুড়ার সিট ফাউন্ডেশন থেকে। তারা কলেজ কোড ব্যবহার করছেন ৩৩৯১/১২০। এদিকে, নিবন্ধন নেয়া বগুড়া থেকে যশোরে অন্য নামে কেমন করে এ প্রতিষ্ঠান চলছে প্রশ্ন করলেও পরিচালক মোজাইদুল ইসলাম কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

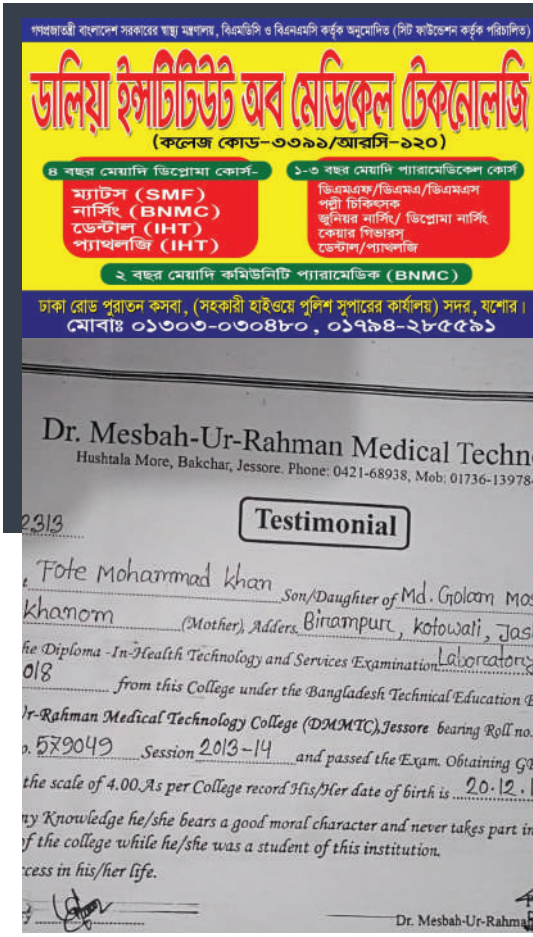
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিএমডিসি ও বিএনএমসি কর্তৃক অনুমোদিত (সিট ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত)

ডালিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি

(কলেজ কোড-৩৩৯১/আরসি-১২০)

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স-
ম্যাটস (SMF)
নার্সিং (BNMC)
ডেন্টাল (IHT)
প্যাথলজি (IHT)

১-৩ বছর মেয়াদি প্যারামেডিকেল কোর্স
ডিএমএফ/ডিএমএ/ডিএমএস
পল্লী চিকিৎসক
জুনিয়র নার্সিং/ ডিপ্লোমা নার্সিং
কেয়ার গিভারস্
ডেন্টাল/প্যাথলজি

২ বছর মেয়াদি কমিউনিটি প্যারামেডিক (BNMC)

ঢাকা রোড পুরাতন কসবা, (সহকারী হাইওয়ে পুলিশ সুপারের কার্যালয়) সদর, যশোর।
মোবাঃ ০১৩০৩-০৩০৪৮০, ০১৭৯৪-২৮৫৫৯১

Dr. Mesbah-Ur-Rahman Medical Techn
Hushtala More, Bakchar, Jessore. Phone: 0421-68938, Mob: 01736-13978-

Testimonial

Fote Mohammad Khan Son/Daughter of Md. Golam Mos
khanom (Mother), Adders Birampur, Kotowali, Jas
he Diploma -In-Health Technology and Services Examination Laboratory
018 from this College under the Bangladesh Technical Education B
r-Rahman Medical Technology College (DMMTC), Jessore bearing Roll no.
. 579049 Session 2013-14 and passed the Exam. Obtaining G
the scale of 4.00. As per College record His/Her date of birth is 20.12.
y Knowledge he/she bears a good moral character and never takes part in
f the college while he/she was a student of this institution.
cess in his/her life.

Dr. Mesbah-Ur-Rahma

প্রতিষ্ঠানটিতে ক্লাস নেন কারা জানতে চাইলে পরিচালক মোজাইদুল ইসলাম জানান, এখানে যশোর মেডিকেল কলেজের প্রভাষক সাবরিনা শবনম ও সিফাত মোস্তফা নামে এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে দু'দিন শুক্র ও শনিবার ক্লাস করান। সত্যতা যাচাইয়ে প্রতিবেদকরা শিক্ষার্থী ছদ্মবেশে প্রতিষ্ঠানটিতে ক্লাস করতে গিয়ে প্রমাণ পান সাবরিনা শবনম ও সিফাত মোস্তফা নামে কোনো ডাক্তার সেখানে ক্লাস নেন না। যাওয়া হয় যশোর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আবু হাসনাত মো. আহসান হাবিবের কাছে। তিনি নিশ্চিত করেন সাবরিনা শবনম ও সিফাত মোস্তফা নামে কোনো শিক্ষক সেখানে কর্মরত নেই।

এদিকে, একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোজাইদুল ইসলামই যশোর শহরের বিভিন্ন স্থানে ঢাকা ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল ডেন্টাল টেকনোলজি, প্রোভাইডার হেলথ সোসাইটি, সেফা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং সিদ্দিক প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশনসহ নামেবেনামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন।

যশোর শহরের ঘোপ বেলতলায় রাইজিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামে চলছে আরেকটি প্রতিষ্ঠান, যা আগে সিটিসি নামে পরিচালিত হতো। এ প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায় তাদেরও কোনো নিবন্ধন নেই। তারা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের আবেদন করেছেন। আগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস চলমান রয়েছে। তারা এখানে হসপিটাল জব ম্যানেজমেন্ট, কেয়ার গিভারস্, অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সিং, প্যারামেডিকেল/ডিএমএস, ফার্মেসি কোর্স, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ভেটেরেনারি/অ্যানিমেল হেলথ্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পরপর কয়েকদিন অবস্থান করে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির ছোট একটি কক্ষে ২০-২৫ জন মেয়ে নার্সিংয়ের ক্লাস করেন। ক্লাস নেন আশরাফুল আলম নামে এক ব্যক্তি। অথচ আদৌ তিনি কোনো ডাক্তার, মেডিকেল বা নার্সিং কলেজের শিক্ষক নন। তিনি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। তার দাবি, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ক্লাস নিচ্ছেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রচারণাপত্রে লিখে রেখেছে 'ফার্মেসি কোর্স ছয় মাস মেয়াদী, ফার্মেসি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফি অনুযায়ী'। বাদবাকি কোর্স সম্পর্কে জানতে চাইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, তারা সরকারের অনুমতি নিয়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন কোর্স করাচ্ছেন। তাদের অনুমোদন অথরিটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ ভিজিট করে গিয়েছেন। অতিদ্রুত লাইসেন্স হাতে পাবেন। তবে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ভিজিট করে দেখা যায়, সংস্থাটি মানবসম্পদ উন্নয়নে নানা কাজ করে। তবে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ব্যাপারে কোনো তথ্য সুস্পষ্টভাবে সেখানে বলা হয়নি।

অনুমতির আগে তারা এটা করাতে পারেন কিনা জানতে চাইলে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুল ইসলাম জানান, তারা ফার্মেসি কোর্স করান না। কেউ ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে সহযোগিতা ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়।

নিউক্লিয়াস নার্সিং ভর্তি কোচিং সেন্টারের আড়ালে যশোর শহরের পালবাড়ি ট্রাফিক মোড়ে একটি ভবনে ক্লাস পরিচালনা করছে বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান। যাদের কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী নেই। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক পরিচয়দানকারী আব্দুল কাদের একাই কোচিং ও প্যারামেডিকেল সেন্টার সামাল দিচ্ছেন। এখানে পল্লী চিকিৎসক, নার্সিংসহ ১০টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম যশোরে চললেও ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বসে এ অফিস চালান মোশারফ হোসেন নামে আরেক ব্যক্তি। একই নামে দু'জেলায় দু'টি প্রতিষ্ঠান কেমন করে চলে জানতে চাইলে আব্দুল কাদের বলেন, তার দায়িত্ব শুধু শিক্ষার্থী ভর্তি ও মাসিক বেতন আদায় করা। এর বেশি তিনি কিছু জানেন না। প্রতিষ্ঠানের কোনো সরকারি অনুমোদন আছে কিনা জানিনা। তবে, জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, যশোর পৌরসভা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয় অবগত আছে বলে তিনি দাবি করেন।

যশোর মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থিত মধুমতি মেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশনে চলছে পল্লী চিকিৎসক, পশু চিকিৎসক, জুনিয়র নার্সিং, ফিজিওথেরাপি ও কেয়ার গিভারস্ কোর্স। ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভর্তিচ্ছু প্রার্থী পরিচয়ে মুঠোফোনে প্রথম দিন কল দিলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রবিউল ইসলাম পরের দিন যেতে বলেন। পরে একাধিকবার ওই প্রতিষ্ঠানে গেলেও বন্ধ পাওয়া যায়। পরে যোগাযোগ করা হলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রবিউল ইসলাম জানান,তাদের প্রতিষ্ঠানের এখনো নিবন্ধন হয়নি। এ জন্য বন্ধ রয়েছে। নিবন্ধন পেলে প্রতিষ্ঠান খোলা হবে।

দু'বছর মেয়াদী প্যারামেডিকেল ও ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্স করাচ্ছে যশোর সদর উপজেলার রূপদিয়া কৃষি ব্যাংকের তৃতীয়তলায় বাহারুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে এখানে ব্যবহারিকসহ সব ধরনের ক্লাস তিনি নিজেই নিয়ে থাকেন। কোনো এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করেননি ক্লাস করানোর জন্য। একটি কোচিং সেন্টারের কক্ষে সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস করানো হয়। আর প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে সাতক্ষীরার বাংলাদেশ টেকনোলজি ফাউন্ডেশন (বিটিএফ) নামে একটি এনজিও।

## মানুষ ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন একমাত্র লক্ষ্য

আলোচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে খোঁজ নিয়ে প্রমাণ মিলেছে, ডালিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি এক বছরে দু'টি ব্যাচে ৫৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ নিয়েছে তিন হাজার টাকা। আয় করেছে এক লাখ ৭৪ হাজার টাকা। প্রতি মাসের বেতন এক হাজার ৫০০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে বেতন তুলেছে ৮৭ হাজার টাকা। বছরে বেতন বাবদ আয় করেছেন ১০ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। তাছাড়া, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট নিতে গুণতে হচ্ছে ১০ হাজার টাকা। ৫৮ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এক বছরে নেওয়া হয়েছে ১৭ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে একবছর মেয়াদী কোর্সে একজন শিক্ষার্থীর খরচ হচ্ছে ৩০ হাজার টাকারও বেশি।

রাইজিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চলতি বছরে নতুন নামে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে তারা রাষ্ট্রীয় চিকিৎসক অনুষদের অধীনে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে ২৮ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যাদের ভর্তি করে প্রতিষ্ঠান আয় করেছে ৮৪ হাজার টাকা। প্রতিমাসে বেতন আদায় হয় ২৭ হাজার টাকা। তারা বছরে দু'টি ব্যাচ থেকে আয় করবে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন প্রথম ব্যাচে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে পল্লী চিকিৎসক ও জুনিয়র নার্সিং কোর্স করাচ্ছে। প্রতি মাসে বেতন বাবদ ৩৭ হাজার টাকা আদায় করে তারা। ভর্তি ফি ও সার্টিফিকেট বাণিজ্য মিলিয়ে তাদের বছরে আয় প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা।

শহরের বাইরের প্রতিষ্ঠান রূপদিয়ার প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। পরিচালক বাহারুল ইসলাম নিজেই ক্লাস পরিচালনা করেন। মাসে খরচ সর্বসাকুল্যে এক হাজার ৫০০ টাকা। ২১ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আয় করছেন প্রতি মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা। বছরে সব মিলিয়ে তাদের আয় প্রায় চার লাখ টাকা।

শিক্ষার্থী ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দিয়ে শহর জুড়ে ডাক্তার তৈরির এসব প্রতিষ্ঠানের নেই কোনো অনুমোদন। কেউ কেউ শুধু পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই চালিয়ে যাচ্ছেন নীরব প্রতারণা; মানুষ ঠকিয়েই অর্থ উপার্জন যাদের একমাত্র লক্ষ্য। আয় করছেন বছরে লাখ লাখ টাকা। এ ক্ষেত্রে নানা প্রলোভন দেখিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহের কাজ করে বিশাল এই চক্রটি। আর প্রার্থীরা ডাক্তার, নার্স হয়ে চাকরির প্রত্যাশা করলেও যে সার্টিফিকেট পাচ্ছেন তা মূলত ভুয়া!

পর্ব: ০২

# বছরের পর বছর চাপাবাজিতেই চলছে প্রতারণা ব্যবসা

বছরের পর বছর চাপাবাজি করেই প্রতারণার জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছে যশোরের 'মিনি মেডিকেল কলেজ' বা ডাক্তার তৈরির কারাখানাগুলো। শহরতলি ও গ্রাম পর্যায়ে কমিশন ভিত্তিক দালাল নিয়োগ করে শিক্ষার্থী সংগ্রহের কাজ করে এসব প্রতিষ্ঠান। চটকদার কথা বলে বিলাসী জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখায়। এক বছরেই ডাক্তার তৈরি করে দেয়ার পর একদিকে বাড়বে সম্মান আর সেই সাথে প্রচুর আয়-এমন প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী। আর সেই সুযোগেই হাতিয়ে নেয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, যশোরে প্রতারণার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা একই হলেও তাদের নিবন্ধন নম্বর ও কলেজ কোড আলাদা। কোর্সসমূহ স্বাস্থ্য বিষয়ক হলেও কেউ নিবন্ধন নিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তথা এনজিও থেকে। কারও কারও দাবি, তাদের প্রতিষ্ঠান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়েছে। কিন্তু গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানের সময় সরকারি কোনো দপ্তরের অনুমোদনপত্র কেউ দেখাতে পারেননি।

## এক বছরেই ডাক্তার!

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, স্বাস্থ্য বিষয়ক দক্ষতা তৈরির এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ একই হলেও তাদের দাবিকৃত রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও কলেজ কোড ভিন্ন। প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছর। অর্থাৎ এক বছরেই তারা ডাক্তার তৈরি করে দিচ্ছেন। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে যশোরের আলোচিত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৭৮ জনকে ডাক্তার হিসেবে সনদ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ডালিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি ২৫ জন, রাইজিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পূর্বের নাম সিটিসি) ২০জন, বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন ১৫জন, প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট ১০জন এবং মধুমতি মেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন আটজনকে ডাক্তারি পাসের সনদপত্র দিয়েছে।

ভুয়া এসব প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিসের অনুমোদন দিচ্ছে বিভিন্ন নামে। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠানের নাম ভিন্ন হলেও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও কলেজ কোড ব্যবহার করছে অনুমোদন দেয়া প্রতিষ্ঠানের। যেমন সাতক্ষীরার বাংলাদেশ টেকনোলজি ফাউন্ডেশন (বিটিএফ) এর কলেজ কোড ৩৪১৫৫। আবার যশোর সদর উপজেলার প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কলেজ কোডও ৩৪১৫৫। একটি প্রতিষ্ঠান সাতক্ষীরায় ও অপরটি যশোরে। নাম ভিন্ন হলেও একই কলেজ কোডে চলছে। আবার এই দু'প্রতিষ্ঠানের মালিকও পৃথক দু'জন।

যশোর জেলার বিভিন্ন শাখা অফিসের কারও নিজ নামে বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ প্যাডের ওপর লিখিত অনুমতি দিচ্ছে শাখা অফিস খোলার জন্য। আর শাখা অফিসের পরিচালকরা ভবন ভাড়া করে ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠান খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ও ক্লাস পরিচালনা করছেন। শাখা অফিসগুলোর ট্রেনিং, ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন প্রায় একই। সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে তিন থেকে ১০ হাজার টাকা গুণতে হয়। আর মাসিক বেতন দিতে হয় দেড় থেকে দু'হাজার টাকা করে। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট নিতেও দিতে হয় টাকা। যশোরের এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতি ব্যাচে ৩০ থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। কোর্স শেষে শাখা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের হেড অফিসে সার্টিফিকেট চেয়ে আবেদন করে। এ সময় অনুমোদন দেয়া প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট দিতে জনপ্রতি শাখা অফিস থেকে আড়াই থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করে থাকে। অনুমোদনদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শাখা অফিসে কতজন শিক্ষার্থী ভর্তি আছে, তারা লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা দিয়েছে কি না তার কোনো খোঁজ রাখেনা। তাদের কাজ হচ্ছে শুধু জনপ্রতি টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট দেয়া। অর্থাৎ শাখা অফিসে ভর্তি হলেও সার্টিফিকেট দেয়া হয় কেন্দ্রীয় অফিসের নামে। মজার ব্যাপার হলো কাকে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান জানেই না। ছয় মাস থেকে এক বছরের কোর্স শেষে যে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিয়ে 'রাজিখুশি' করাতে পারবে তার ফলাফলই ভালো হবে। হেডঅফিসগুলো ব্যবসার পসার জমাতে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তারা তাদের শাখা অফিস থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের ফলাফল ঘোষণা করে নিজস্ব ওয়েবসাইটে। সেখানে শিক্ষার্থী বা অন্য কেউ রোল নম্বর সার্চ দিলে পাসের সাল ছবিসহ রেজাল্ট দেখতে পাবে। কিন্তু সরকারি কোনো সাইটে এসব প্রতিষ্ঠানের নাম বা শিক্ষার্থীর রেজাল্ট প্রকাশ হয় না। অথচ প্রতিষ্ঠানগুলো দাবি করছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে তারা মেডিকেল কোর্স পরিচালনা করছে।

## সরকারি নীতিমালায় যা আছে

পল্লী চিকিৎসক ও গ্রাম ডাক্তার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের কোনো নীতিমালা নেই। সরকারি বিধি অনুযায়ী ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও প্যাথলজিস্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন দেয়ার একমাত্র এখতিয়ার রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় শর্ত সাপেক্ষে বেসরকারি মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট স্কুল (ম্যাটস) ও কমিউনিটি প্যারামেডিকেল কোর্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার অনুমোদন দিয়ে থাকে। এর বাইরে কোনো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অনুমোদন দিতে পারবে না। এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

'কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৩'-তে বলা হয়েছে, সরকার ও বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত দু'বছর মেয়াদি কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্নকারী এবং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকৃতদের 'কমিউনিটি প্যারামেডিক' বলা হবে। তারা নিজস্ব উদ্যোগে গ্রামীণ জনপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবেন। তারা পল্লী চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন। এছাড়া কেউ অন্য কোনো স্থান থেকে তিন ও ছয় মাস অথবা এক বছরের পল্লী চিকিৎসক কোর্স সম্পন্ন করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারবেন না।

বেসরকারি খাতে মেডিকেল টেকনোলজি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য রয়েছে আলাদা নীতিমালা। ২০১০ সালে জারিকৃত সরকারি ওই নীতিমালায় বলা হয়েছে, বেসরকারি খাতে মেডিকেল টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের দিক নির্দেশনা প্রদান তথা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুদক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০টি নিয়মিত কোর্সে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সরকারি অনুমোদনে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ ও বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের যে কোনো নতুন কোর্স চালু করাসহ কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগও রাখা হয়েছে। তবে, প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে কমপক্ষে দু'টি কোর্স একসঙ্গে চালু করতে হবে। সরকার অনুমোদিত ১০ কোর্সের মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাবরেটরি), ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং), ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ডেন্টাল), ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ফিজিওথেরাপি), ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (অকুপেশনাল থেরাপি), ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওথেরাপি), ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (স্যানিটারি ইন্সপেক্টরশিপ), সার্টিফিকেট কোর্স ইন অপথ্যালমিক অ্যাসিসট্যান্ট, সার্টিফিকেট কোর্স ইন কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকারস, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ফার্মেসি)।

এসব কোর্সের মধ্যে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্স বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং অন্য কোর্সগুলো পরিচালিত হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক। বেসরকারি মেডিকেল টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো, টিচিং স্টাফ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স চালু করা যাবে। তবে, বিএসসি কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হতে হবে। এ ছাড়া, অন্য কোনো স্থান থেকে অনুমোদন নিয়ে কোর্স পরিচালনা করা যাবে না।



বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল এ্যান্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন

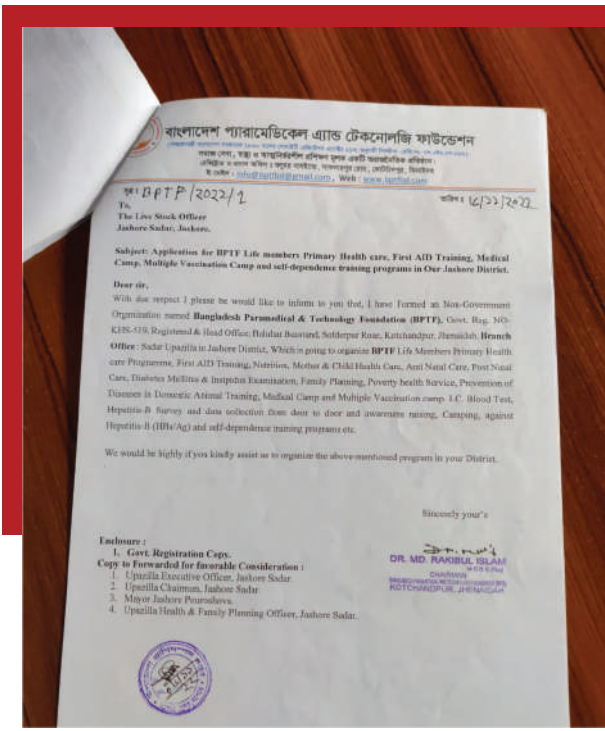

স্মারক: BPTP/2022/1

তারিখ: 6/11/2022

To,
The Live Stock Officer
Jashore Sadar, Jashore.

**Subject: Application for BPTF Life members Primary Health care, First AID Training, Medical Camp, Multiple Vaccination Camp and self-dependence training programs in Our Jashore District.**

Dear sir,

With due respect I please be would like to inform to you that, I have formed an Non-Government Organization named **Bangladesh Paramedical & Technology Foundation (BPTF).** Govt. Reg. NO-KHS-519, Registered & Head Office: Bolidar Busstand, Solderpur Road, Kotchandpur, Jhenaidah. **Branch Office**: Sadar Upazilla in Jashore District, Which is going to organize **BPTF** Life Members Primary Health care Programme, First AID Training, Nutrition, Mother & Child Health Care, Anti Natal Care, Post Natal Care, Diabetes Mellitus & Insipidus Examination, Family Planning, Poverty health Service, Prevention of Diseases in Domestic Animal Training, Medical Camp and Multiple Vaccination camp. I.C. Blood Test, Hepatitis-B Survey and data collection from door to door and awareness raising, Camping, against Hepatitis-B (HBs/Ag) and self-dependence training programs etc.

We would be highly if you kindly assist us to organize the above-mentioned program in your District.

Sincerely your's

DR. MD. RAKIBUL ISLAM
CHAIRMAN
KOTCHANDPUR, JHENAIDAH

**Enclosure:**
1. **Govt. Registration Copy.**

**Copy to Forwarded for favorable Consideration:**
1. Upazilla Executive Officer, Jashore Sadar
2. Upazilla Chairman, Jashore Sadar
3. Mayor Jashore Pourashava.
4. Upazilla Health & Family Planning Officer, Jashore Sadar.

## যা বলছেন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা

এ- প্রসঙ্গে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক (নিবন্ধন) উপসচিব জেসমীন আক্তারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তার কাছে জানতে চাওয়া হয় চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুমোদন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দেয় কি না? তিনি নিশ্চিত করেন, চিকিৎসা শিক্ষা তথা ডাক্তার, নার্স তৈরি করার কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তাদের নেই। এমনকি বেসরকারি পর্যায়ে ডাক্তার, নার্স তৈরির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণের অনুমোদনও দেয়া হয় না।

সমাজসেবা অধিদপ্তর যশোরের উপপরিচালক অসিত কুমার সাহা গ্রামের কাগজকে নিশ্চিত করেছেন চিকিৎসা শিক্ষাসহ স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অনুমোদন দেয়ার কোনো এখতিয়ার তাদের নেই। যদি কেউ সমাজসেবা অধিদপ্তরের নাম ভাঙিয়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তাহলে তা স্রেফ প্রতারণা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যশোরের উপপরিচালক শাহীদুল ইসলাম জানান, চিকিৎসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার অনুমোদন দেয়ার কোনো সুযোগ তাদের নেই। বেকারদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে শুধু গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালনের তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেটিও হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে নিজস্ব কার্যালয়ে।

সরকারি নীতিমালা ও যেসব দপ্তরের দোহাই দিয়ে প্রতারণা চলছে তাদের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট। কিন্তু এরপরও বছরের পর বছর প্রতারকদের বাণিজ্য অব্যাহত আছে। আর ভুয়া এসব প্রতিষ্ঠানের তৈরি তথাকথিত ডাক্তার নার্সসহ অন্যান্য কর্মীর কবলে পড়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে সাধারণ মানুষ।

শেষ পর্ব

# অবৈধ প্রতিষ্ঠান চলছে বছরের পর বছর, খোঁজ রাখে না কেউই

যশোরের অবৈধ 'মিনি মেডিকেল কলেজ' তথা ডাক্তার-নার্স তৈরির কারখানা বিভিন্নভাবে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে এ এলাকার মানুষকে। গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে নানামুখী সমস্যা আর অস্থিরতার চিত্র। এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটধারীরা চাকুরি না পেয়ে এখন চরম হতাশ। বাধ্য হয়ে অনেকেই আগের মতো বেকার অবস্থায় পরিবারের বোঝা হয়ে আছেন। ডাক্তার-নার্স হওয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ায় সামাজিকভাবে অসম্মানিতও হচ্ছেন। অন্যদিকে অনেকেই সার্টিফিকেটের বদৌলতে চিকিৎসা দিতে গিয়ে নিজেরাও বিপদে পড়ছেন, সাধারণ মানুষকেও বিপদগ্রস্ত করে তুলছেন। রোগের ধরন না বুঝেই রোগীকে ওলটপালট ওষুধ সেবন করানোয় প্রাণহানিসহ ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছে। এতে কলহ বিবাদ সৃষ্টি হওয়াসহ রোগীর অপচিকিৎসার বিচার দাবিতে আদালতে মামলার ঘটনাও ঘটছে।

## প্রশিক্ষণার্থীরা অন্ধকারে, মিলছে না চাকরি

ভুয়া প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট কোনো কাজে আসছে না শিক্ষার্থীদের। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করে তারা বিতাড়িত হচ্ছেন। কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে অপমান অপদস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন বাড়ি। অনেকে ঘরবন্দি থাকছেন মানুষের কটু কথা থেকে রেহাই পেতে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পল্লী চিকিৎসক ও জুনিয়র নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নরত অধিকাংশ শিক্ষার্থী জানেননা তারা যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সেটি সরকার অনুমোদিত কিনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্য শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তারা এ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন। সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করতে গিয়ে তারা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। আর যারা বুঝতে পারছেন, তাদের অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেননা, আগেই এ সব প্রতিষ্ঠান তাদের কাছ থেকে জনপ্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

ডাক্তার হবার আশায় যশোর সদর উপজেলার দেয়াড়া ইউনিয়নের নারাঙ্গালী গ্রামের আজম হোসেন কেশবপুরের প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন (পিটিএফ) এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি তিন বছর মেয়াদি ডিএমএফ কোর্স করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে তার কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয়নি। লজ্জায় কাউকে কিছু বলতেও পারেননি। নিজেই চেম্বার খোলার অনুমতি আনতে সিভিল সার্জন অফিসে গেলে জানানো হয় তার সার্টিফিকেট ভুয়া। বর্তমানে তিনি শহরের একটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মার্কেটিং অফিসারের চাকরি করছেন।

ভুক্তভোগী আজম হোসেন বলেন, প্রশিক্ষণ শেষে তাদের যশোর জেনারেল হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করাবার কথা ছিলো। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয়, সরকারি হাসপাতালে 'ম্যাটস' ছাড়া কারও ইন্টার্নশিপ করা সরকারি ভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে চেম্বার খুলে রোগী দেখতেও পরামর্শ দেয় ওই প্রতিষ্ঠান।

শহরের ঘোপ বেলতলায় রাইজিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী প্রগতি হালদার। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি পল্লী চিকিৎসকের কোর্স করেছেন। আগে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিলো 'সিটিসি'। সরকারি বা বেসরকারি কেনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ হয়নি তারও। ডাক্তারের সহকারী হিসেবেও একটি কাজ জুটাতে পারেননি। প্রথমে ফার্মেসি ও পরে সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা বাজারে 'হালদার চিকিৎসালয়' নামে একটি চেম্বার খুলেছেন। ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি তিনি রোগী দেখেন। সিটিসি ঘোপ জেল রোড বেলতলা থেকে তিনি পাশ করলেও তার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে ঢাকার কমিউনিটি ট্রেনিং সেন্টার নামে একটি সেন্টার থেকে। যেটি সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। এমন একটি ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে গ্রামবাসীকে কেমন চিকিৎসা দিচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

একই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করেছেন চৌগাছা বাজার এলাকার মানিক চাঁদ নামে এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, বহুদিন চাকরির খোঁজ করেছি। কোথাও পাইনি। যে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, সেই প্রতিষ্ঠানও এখন নেই। তারা নাম বদলে ফেলেছে। এখন বাধ্য হয়েই নিজ গ্রামে একটি ফার্মেসি খুলেছি। সেখানে রোগীও দেখি। এসব ভুক্তভোগীর মতো অসংখ্য শিক্ষার্থী প্রতিবছর যশোরের ওইসব ভুয়া প্রতিষ্ঠান থেকে কোর্স করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

যশোরের বাঘারপাড়া থানার খানপুর এলাকার এক পল্লী চিকিৎসকের অপচিকিৎসায় আজও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন সেলিনা বেগম নামের এক নারী। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামী চলতি বছরের ১৪ নভেম্বর যশোরের আদালতে মামলা করেছেন। ওই মামলায় বলা হয়েছে, শারীরিক অসুস্থতার জন্য কথিত চিকিৎসকের পরামর্শে সেলিনা বেগমকে ওষুধ সেবন করানো হয়। যাতে রোগীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে। পরিবারের লোকজন তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসকরা জানান যে, পূর্বের চিকিৎসকের দেয়া ওষুধের কারণে রোগীর ফুসফুস ও লিভারে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

যশোর শহরের চাঁচড়া ডালমিল এলাকার গৌতম মন্ডল নামে এক পল্লী চিকিৎসক ধারাবাহিকভাবে অপচিকিৎসা করছেন। তার অপচিকিৎসার শিকার হয়ে সোহেল নামে যুবকের জীবন বর্তমানে সংকটাপন্ন। এ ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

মামলার অভিযোগে জানা গেছে, ডালমিল এলাকার শহিদের ছেলে সোহেল জ্বরে আক্রান্ত হয়। চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি তিনি ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে চাঁচড়া বাজার মোড়ের আদ্রিকা

মেডিকেলে যান। এ সময় গৌতম মন্ডল নিজেকে এমবিবিএস ডাক্তার পরিচয় দিয়ে সোহেলকে দেখতে যান। প্রেসক্রিপশন করে নিজের দোকান থেকে ওষুধ দিয়ে তিন দিন সেবন করতে বলেন। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সেবনে সোহেলের পেটে তীব্র ব্যথা ও কয়েকবার বমি হয়। ২৫ জানুয়ারি সোহেলের অবস্থা আরও খারাপ হলে তাকে শহরের একটি ক্লিনিকে ডাক্তার দেখানো হয়। শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত হন সোহেলের পেটের নাড়ি ছিদ্র হয়ে গেছে। জীবন রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তার অপারেশন করা হয়। গৌতম মন্ডল একজন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তার না হয়েও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে প্রেসক্রিপশন করে রোগীর চিকিৎসা দিয়ে জীবন সংকটাপন্ন করায় ভুক্তভোগীর বাবা আদালতে মামলা করেন।

## বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যা বলছেন

যশোরে কর্মরত অর্থোপেডিক্স ট্রমা স্পাইন বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাক্তার আব্দুল্লাহ গাদ্দাফী রানা বলেন, তার ব্যক্তিগত চেম্বারে আসা শতাধিক রোগীর মধ্যে ৬০ ভাগ রোগী গ্রাম পর্যায় চিকিৎসা নিয়ে অপচিকিৎসার শিকার হয়ে থাকেন। ডায়াবেটিস রোগীরা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা করিয়ে থাকেন। অথচ রোগী জানেই না তার ডায়াবেটিস রোগ আছে। আর যারা পল্লী চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা করছেন তারাও রোগীর রোগ সম্পর্কে অবগত থাকেন না। রোগীর জীবন সংকটাপন্ন হলেই আসেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে। ততদিনে তাদের অধিকাংশই 'ডায়াবেটিস ফুট' রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। যাতে করে সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে জীবন বাঁচাতে পা কেটে ফেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ছোট বড় যে কোনো সমস্যায় দুর্ঘটনা এড়াতে অনভিজ্ঞ পল্লী চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পরামর্শ দেন তিনি।

## সমিতির নেতার বক্তব্য

ডাক্তার পরিচয় দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা সম্পর্কে কথা হয় বাংলাদেশ গ্রাম ডাক্তার কল্যাণ সমিতি যশোর শাখার সভাপতি আব্দুল মান্নানের সাথে। তিনি বলেন, অনেকেই মাত্র ৬ মাসের একটি কোর্স করে নামের আগে ডাক্তার লিখে মানুষকে অপচিকিৎসা করছে। এদের জন্য তাদের মতো প্রকৃত গ্রাম ডাক্তারদের মানুষ এখন ছোট চোখে দেখে। বর্তমানে বাজারে বাজারে গ্রাম ডাক্তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামে বহু বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যাদের কোনো সরকারি রেজিস্ট্রেশন নেই। সেখানে যারা ক্লাস করান তারাও কেউ ডাক্তার নন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এক ছাতার নিচে নিয়ে এসে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। তা না হলে তাদের মতো গ্রাম ডাক্তাররা পেশাগত ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

## ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ করছে যারা

গ্রামের কাগজের দীর্ঘ অনুসন্ধানে ঘুরেফিরে বারবার আসছে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম। যারা বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় শাখা খুলে প্রতারণা করছেন। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, বগুড়ার সিট ফাউন্ডেশন, যশোর কেশবপুরের প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন (পিটিএফ) ও সাতক্ষীরার বাংলাদেশ টেকনোলোজি ফাউন্ডেশন (বিটিএফ)। এদের মধ্যে সাতক্ষীরার বাংলাদেশ টেকনোলোজি ফাউন্ডেশনের ওয়েব সাইটে দাবি করা হয়েছে, তাদের অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড । তাদের কলেজ কোড ৩৪১৫৫। সারাদেশে তাদের ২৮টি শাখা অফিস আছে। বিটিফ-এর

সাইট বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তারা একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী ও মানবকল্যানধর্মী প্রতিষ্ঠান। সে হিসেবে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে।

বাংলাদেশ টেকনোলোজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এমএ হান্নান গ্রামের কাগজকে জানান, ২০১৫ সাল থেকে তিনি গ্রাম ডাক্তার, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও টেকনিশিয়ান কোর্স পরিচালনা করছেন দেশব্যাপী। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুমোদন নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তবে গ্রাম ডাক্তারসহ চিকিৎসা বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কি না জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

বগুড়ার সিট ফাউন্ডেশন তাদের ওয়েব সাইটে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে তারা পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ও বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত। তাদের সরকারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩৩৯১। সারাদেশে তারা বিভিন্ন নামে ৫৫৬ টি শাখা পরিচালনা করছেন।

প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ও বেকার তরুণ-তরুণীর বেকারত্ব দূর করতে তারা কাজ করছেন। কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা প্রদান বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারি অনুমোদন নেয়া হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন। আব্দুল মান্নান দাবি করেন 'সিট ফাউন্ডেশন' একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণে কাজ করতে বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠান খুলে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। সিট ফাউন্ডেশনের নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ যদি ডাক্তার তৈরির প্রশিক্ষণের অবৈধ ব্যবসা করে তার দায় সম্পূর্ণ ওই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের।

এদিকে যশোরের কেশবপুরে প্যারামেডিকেল এন্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন (পিটিএফ) তাদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তারা অনুমোদন নিয়েছে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর কেএইচএস-৪৪৩। তারা মূলত কেশবপুর, মণিরামপুর ও অভয়নগরে প্রতিষ্ঠান খুলে ব্যবসা করছেন।

পিটিএফ-এর চেয়ারম্যান পরিচয়দানকারী একে আজাদ-ইখতিয়ার বলেন, তার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হাজার-হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি স্বাস্থ্য বিভাগ ও সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন নিয়েছেন বলে দাবি করেন। কিন্তু তার দাবির কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। ডাক্তার তৈরির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর কোনো অনুমোদনপত্র তিনি দেখাতে পারেননি।

এব্যাপারে যশোরের সিভিল সার্জন ডাক্তার মাহমুদুল হাসান জানান, বেসরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) গুলো সরকারি অনুমোদন লাভের পর পরিচালিত হয়। এছাড়া অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান মেডিকেল বিষয়ক বিভিন্ন ট্রেনিং পরিচালনা করে তারা কার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে তা জানা নেই। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানের নাম বা অনুমতিপত্র সিভিল সার্জন অফিসে নেই । তিনি আরো জানান, ডাক্তার, নার্সসহ চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্সের নামে যেসকল প্রতারণামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে তা তার অজানা। শীঘ্রই তিনি খোঁজ খবর নেবেন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোনোভাবেই যাতে মানুষ প্রতারণার শিকার না হয় সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিভাগ সজাগ দৃষ্টি রাখবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

## যশোরে যেভাবে শুরু

যশোরে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমাউস নামে পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মতিয়ার রহমান নামে এক ব্যক্তি শহরের জেলরোড বেলতলা এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬মাস। ১৫জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় প্রতিষ্ঠানটির। খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে ওই প্রতিষ্ঠানটিতে এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তার শরিফুল ইসলাম শিক্ষক হিসেবে পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাস নিতেন। বর্তমানেও ১৫জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বলে নিশ্চিত করেছেন আমাউসের প্রতিষ্ঠাতা মতিয়ার রহমান। যশোরে পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর প্রথম উদ্যোক্তা মতিয়ার রহমান বলেন, বহু চেষ্টা তাগাদা করেও সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তথা স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো দপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে পারেননি। অথচ সময়ের পরিবর্তনে তথা ২০২০ সালের পর থেকে যশোর শহরসহ আশপাশের হাটে বাজারে ডাক্তার তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। চকটদার বিজ্ঞাপন ও লিফলেট বিতরণ করে অল্প সময়ে অধিক টাকা আয়ের উদ্দেশ্যে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মানুষের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। প্রকাশ্যে প্রতারণা চললেও এসব নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো বিভাগই ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

## সরকারি যে সুযোগ রয়েছে

সারা দেশে সরকারি পর্যায়ে মাত্র ১৩টি ও বেসরকারি পর্যায়ে একশ' ৭৮ টি 'ম্যাটস' প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় যশোরে নেই একটিও। দেশে সরকারি তালিকাভুক্ত মেডিকেল এ্যাসিসট্যন্ট ট্রেনিং স্কুলগুলো রয়েছে নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, গাজীপুর, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, নঁওগা ও মাদারীপুরের শিবচরে ।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় যশোরে স্টেট মেডিকেল ট্রেনিং একাডেমি ও মেসবাহ-উর-রহমান ম্যাটস নামে রয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান। এর বাইরে যশোরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট স্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়।

## শেষ কথা

যশোরে ডাক্তার তৈরির নামে ভুয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে ব্যবসা চললেও এক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে স্বাস্থ্য বিভাগ কিংবা জেলা প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ নেই। সংঘবদ্ধ প্রতারকচক্র ওইসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ঠকিয়ে লাভবান হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই প্রতারকচক্র তাদের ব্যবসা কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতারক চক্র এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে চরম সন্দেহ লক্ষ্য করা গেছে।

যশোর স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন নানা ইস্যুতে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করে। অনিয়ম পেলে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের লাইসেন্সধারী ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে মোটা অংকের জরিমানা বা সিলগালাও করা হয়। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো প্রকাশ্যে প্রতারণার ফাঁদ পেতে ডাক্তার-নার্স তৈরির কারখানাগুলোতে কখনো কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা অভিযান পরিচালিত হয়নি। ফলে যশোর শহর ও জেলাজুড়ে ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দিয়ে ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও প্যাথলজিস্ট তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আর এর খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ।

গ্রুপ-২

# জেলেরা পান না জলের অধিকার

প্রণব দাস ও সোহরাব হোসেন

# লেখক পরিচিতি

## প্রণব কুমার দাস

প্রণব কুমার দাস যশোর শহরের বাসিন্দা ও সাংবাদিক। তিনি ব্যবসায়ী বাবা গুরুপদ দাস ও গৃহিণী মা রেনুকা দাসের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ১৯৬৯ সালের ১৫ মে জন্মগ্রহণ করা প্রণব যশোর জিলা স্কুল থেকে এসএসসি ও যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। পরে যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ২০১০ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন। আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করেন। ২০১৮ সালে 'ধর্মীয় সহিষ্ণুতা' বিষয়ে রিপোর্টিংয়ে পুরস্কৃত হন। বর্তমানে তিনি দৈনিক রানার পত্রিকায় ডেপুটি এডিটর হিসেবে কর্মরত।

## সোহরাব হোসেন

সোহরাব হোসেন দৈনিক রানার পত্রিকায় ১৯৯৯ সালে মফস্বল সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে ২০০৯ সালে বার্তা সম্পাদক, ২০১০ সাল থেকে দৈনিক সমাজের কাগজ এ সম্পাদক এবং দৈনিক কল্যাণে সম্পাদনা সহকারী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন। ২০২৪ সালে তিনি সাকমিড থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। যশোর-এর সাংবাদিকদের জন্য ফেলোশিপ-এ দলীয়ভাবে বিশেষ প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন।

পর্ব: ০১

# প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণেই সরকারি বাঁওড়

‘অন্য কোনো কাজতো শিখিনি; মাছের পোকা না ধরলি প্যাটতো চলে না,’ সত্তরোর্ধ্ব সুকুমার তরফদার ডিঙি নৌকায় বসে নিজের জীবন সংগ্রামের কথা বলেন। সুকুমার যশোর সদর উপজেলার জগহাটি বাঁওড় পাড়ের বাসিন্দা। প্রতিদিন ভোরে ফজরের আজানের পরপর মাছ শিকারে বের হন তিনি। বেলা ১১টা পর্যন্ত যা মাছ পান তা বাজারে বিক্রি করে চাল, ডাল, তেল, নুন কিনে বাড়ি ফেরেন।

- যশোর জেলায় সরকারি জলমহাল ৫২টি
- ইজারার আওতায় ৩৬টি
- উন্মুক্ত ৬টি
- স্মার্ট কার্ডধারী মৎস্যজীবী ১৭,৬১৫ জন

যশোর শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে সুকুমারের গ্রাম। সেখানে তার মতো অসচ্ছল প্রায় ৩০০ জেলে পরিবারের বাস। প্রবীণ থেকে শিশুরা বাঁওড়ে মাছ ধরে জীবন চালায়। সুকুমারের মতই সংগ্রামী জীবন সবার। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের জেলে পরিবারগুলোর জন্য নানা সরকারি বিধি-বিধান তাদের জীবন সংগ্রামকে আরও কঠিন করে তোলে। যার মধ্যে একটি হলো- বাঁওড় নামক প্রাকৃতিক জলাশয়ের ইজারা প্রথা।

মৎস্য বিভাগের তথ্যানুসারে, যশোর জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে মোট দেড় হাজার হেক্টর জায়গা জুড়ে বাঁওড় আছে। সংখ্যার হিসেবে ৫২টি বাঁওড়। এসব জলাশয়কে আশ্রয় করে প্রকৃত মৎস্যজীবী আছেন ৪১ হাজার ৭৭৩ জন। বাঁওড়গুলোতে মাছ চাষের জন্য ইজারা প্রথা বহু পুরানো, সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কাল থেকে শুরু। তবে বাংলাদেশ স্বাধীনের পর তিন দশক ইজারা প্রথা ছিল না। মাছ ধরার জন্য সবই জেলেদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রায় আড়াই দশক আগে আবার ইজারা প্রথা শুরু হয়, শুরু হয় বিচিত্র জটিলতা, যা প্রকৃত জেলেদের সংগ্রামী জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তোলে, নানা ঝুট-ঝামেলা ও জটিলতায় ফেলে। এই ইজারা প্রথার বিদ্যমান সরকারি নীতিমালার স্লোগান- ‘জাল যার জলা তার।’ কিন্তু সরেজমিনে ঘুরে ও অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায়, বাস্তবতা ভিন্ন। সুকুমারের মত বহু জেলে জানান, জলে জেলেদের নয়, একদল স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রমেই, তারাই মূলত জেলেদের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে, ভিন্নভাবে বললে জেলেদের জীবন-জীবিকা সেসব বিত্তবান প্রভাবশালীদের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে।

## বাঁওড় ইজারার আদি কথা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমল থেকেই জলমহাল বা বাঁওড়গুলো সরাসরি ডাকের মাধ্যমে ভূমি অফিস থেকে ইজারা প্রদান করা হতো। আয়তন হিসেবে ৫ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ বা ১০০ টাকা দিয়ে জলমহালের ইজারা নিতে হতো। এরপর ইজারাপ্রাপ্ত জলমহালের তীরবর্তী জেলেরাই সেখানে মাছ চাষ ও সেগুলো ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এসব জানান সত্তরোর্ধ্ব সুনিল বিশ্বাস। তিনি বংশ পরম্পরায় যশোর সদরের চুড়ামনকাটি গ্রামের ভৈরব নদ তীরবর্তী জেলে বর্তমানে চুড়ামনকাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি।

সুনিল জানান, বাংলাদেশ স্বাধীনের আগে পাকিস্তান আমলে নামমাত্র ইজারা মূল্যে সরাসরি ডাকের মাধ্যমে সরকারি সব ধরনের জলমহাল জেলেদের মধ্যে ইজারা প্রদান করা হতো। যশোরের ভৈরব নদেও নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক ইজারা দেয়া হতো। তিনি নিজেও ৯০ টাকা দিয়ে ভৈরব নদের একটি নির্দিষ্ট এলাকা ভূমি অফিস থেকে ইজারা নিয়েছিলেন। তখন তারা সবাই ইজারাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে মাছ শিকার করতেন। সুকুমারের ভাষ্য- 'তখন যা মাছ পেতাম সেগুলো বিক্রি করে খুব ভালোভাবেই সংসার চলতো।' ১৯৭২ সাল থেকে আবার ভৈরব নদসহ সব প্রাকৃতিক জলাশয় জেলেদের জন্য নিয়ন্ত্রণহীনভাবে উন্মুক্ত করে দেয় সরকার। ২০০০ সাল পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ছিল। উন্মুক্ত জলাশয়ে যে কোনো জেলে মাছ ধরতে পারতো।

## আবার যখন ইজারা প্রথা ফিরে

সুনিল ও আরও কয়েকজন জেলের সাথে কথা বলে জানা যায়, ২০০১ সাল থেকে আবার প্রাকৃতিক জলাশয়ে ইজারা প্রথা চালু করে সরকার। বিভিন্ন জেলে পল্লিতে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করার ব্যবস্থাপনা চালু হয়। প্রথমদিকে ইজারামূল্য কম থাকায় জেলেরা সরকারি বিল, বাঁওড়, নদী, খাল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ হিসেবে বলেন 'রাজনৈতিক প্রভাবশালী বিত্তবানদের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে' এই খাতটির ওপর। তারা নেপথ্যে থেকে জেলেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে, গঠন করতে থাকে সমবায় সমিতি। দৃশ্যের আড়ালে থাকা প্রভাবশালী বিত্তবানরা সমিতির নামে বেশি মূল্যে ইজারা নিয়ে ওই সমিতিভুক্ত জেলেদের মাধ্যমে মাছ চাষ করা শুরু করেন। জেলেদের নামমাত্র কিছু টাকা দিয়ে লাভের প্রায় পুরোটাই নিজেরা ভোগ করেন। ২০০৯ সালে নীতিমালার আওতায় আনা হয় সমিতিগুলোকে। এরপর থেকে একেকটি জেলে পল্লিতে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা নেপথ্যে থেকে একাধিক সমবায় সমিতি গঠন করেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম জানান, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি- ২০০৯-এ বলা হয়েছে- 'যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন। তার ভাষ্য- নিবন্ধিত জেলেরা সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে জলমহাল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করছেন। জেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে, যশোর জেলায় সরকারি মোট ৫২টি জলমহাল বা বাঁওড়ের ৩৬টি ইজারার আওতায় আছে, ৬টি আছে উন্মুক্ত। বাকী ১০টি বাঁওড় মামলার কারণে ইজারা দেয়া সম্ভব হয়নি।

ইজারা দেয়া ৩৬টি বাঁওড়ের মধ্যে যশোর সদরে ৩টি, মণিরামপুরে ৪টি, কেশবপুরে ২টি, বাঘারপাড়ায় ৩টি, অভয়নগরে ২টি, চৌগাছায় ৮টি, ঝিকরগাছায় ৬টি ও শার্শায় রয়েছে ৯টি। সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, বাঁওড়ের তীরবর্তী এলাকা ঘিরে জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। যারা বংশ পরম্পরায় শত শত বছর ধরে মাছ শিকার করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন।

যশোর জেলা সমবায় কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, যশোরের আট উপজেলায় প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতি রয়েছে ৯৪টি। এর মধ্যে মণিরামপুরে ১৬টি, সদরে ১৫টি, বাঘারপাড়ায় ৮টি, অভয়নগরে ১১টি, চৌগাছায় ১৩টি, ঝিকরগাছায় ৬টি, কেশবপুরে ৬টি এবং শার্শায় ১৯টি। জেলায় মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য প্রায় তিন হাজার ৩০০ জন। জেলা সমবায় কর্মকর্তা এসএম মঞ্জুরুল হক জানান, সরকারি নীতিমালা মেনে সমিতির নিবন্ধন দেয়া হয়, এক্ষেত্রে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই।

## ইজারায় অধিকার, ইজারায় বঞ্চনা

ইজারা প্রথার বিদ্যমান নীতিমালার যে স্লোগান- 'জাল যার, জলা তার' শুনলে যে কারও মনে হতে পারে যে সকল জেলের অধিকার সংরক্ষিত আছে। কাগজে কলমে তা আছে বটে, কিন্তু সরেজমিনে বাঁওড় এলাকায় প্রতিবেদনের কাজ করার সময় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, যশোর জেলার ৩৬টা বাঁওড় পাড়ের জেলেদের অনেকেই জাল থাকা সত্ত্বেও ইজারা না পাওয়ায় বাঁওড়ে জাল ফেলতে পারেন না, মাছও ধরতে পারেন না। ফলে এই ইজারা প্রথা একদিকে জেলেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য হলেও সময়ে সময়ে বিপুল সংখ্যক জেলের জন্য বঞ্চনার নিষ্ঠুর বাস্তবতাও তৈরি করেছে। এছাড়াও এই ইজারা প্রথা প্রকৃত জেলেদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনি, এমন পর্যবেক্ষণ জানান যশোরের মণিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ ঝাঁপা বাঁওড় এলাকার মৎস্যজীবী সুধাংশু, হরেকৃষ্ণ, গণেশ, নিমাই বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে।

একই সুর মেলে যশোরের চৌগাছা উপজেলার বল্লভপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুমার রায় ও সাধারণ সম্পাদক তারক কুমার বিশ্বাসের কণ্ঠে। এদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়- বিত্তবানরা তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব দিয়ে মূলত মৎস্যজীবী সমিতিগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতার নামে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক অর্থ বিনিয়োগ করে। এই প্রভাবশালীদের রাজনীতি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা আছে। যখন যেই প্রভাবশালী বিত্তবানের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে তাদের নিয়ন্ত্রিত সমিতি ইজারা পায়। অন্যভাবে বললে, নেপথ্যে এই ইজারা প্রাপ্তির কলকাঠি নাড়ে প্রভাবশালী বিনিয়োগকারীরা। ফলে তাদের স্বার্থ ও ইচ্ছে অনুযায়ী ইজারাপ্রাপ্ত সমিতিকে সকল কাজ করতে হয়। সমিতির সদস্যরা এমন ব্যবস্থাপনা মেনে না নিতে চাইলেও মেনে নিয়েই চলতে হচ্ছে। নানা দুঃখের পরও তাদের নিরুপায় মত- ইজারা প্রথাই ভালো, কেননা কাগজে- কলমে হলেও জলাশয়গুলো জেলেদের ভোগ করতে পারার সুযোগ রাখা আছে। এটুকু বাধ্যবাধকতার প্রথা না থাকলে প্রভাবশালীরাই সবটুকু বাঁওড় ইচ্ছেমতো দখল করে নিত।

## একই দুঃখ-গাঁথা নানান বাঁওড়ে

বাঁওড় নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে অনুসন্ধান চালানো হয় যশোর জেলার বেশ কয়েকটি আলোচিত বাঁওড়ে। এমনই একটি কেশবপুরের মর্শিনা বাঁওড়। এই বাঁওড় পাড়ে বসবাস করেন গণেশ সরকার (৫০)। দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক তিনি। ছেলে দুটোকে বিয়ে দিয়েছেন, মেয়েটা এখনো ছোট, স্থানীয় স্কুলে ৩য় শ্রেণিতে লেখা-পড়া করে। পৈত্রিক সূত্রে জেলে হলেও এখন তিনি সেলুনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। দুই ছেলে মাঠে পরের ক্ষেত খামারে কাজ করেন। 'জাহানপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে তাদের বাঁওড়টি ইজারা দেয়া হলেও মূলত দখল করে আছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই অবস্থা, ফলে এখন আর ওই বাঁওড়ে নামা যায় না। সংসার চালাতে তাই তিনি সেলুনের কাজ বেছে নিয়েছেন। ছেলে দুটোও অন্য কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন।

গণেশ সরকারের মতো পেশা বদল করে অন্য কাজ করে সংসার নির্বাহ করেন একই এলাকার অবিনেশ সরকার, অনিল সরকার, দীলিপ সরকার, বৃদ্ধ নিমাই চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণপদ সরকারসহ অনেকেই। তারা বলেন- মর্শিনা বাঁওড় পাড়ে বসবাসকারী জেলেদের মধ্যে প্রায় সবাই পেশা বদল করে অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। সরকারের ইজারা প্রথা তাদেরকে পেশা বদল করতে বাধ্য করেছে বলে মত দেন তারা সকলেই।

পর্ব: ০২

# ক্ষমতার পালা বদলে বাঁওড়ে দখলের রাজত্ব

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ৮ জানুয়ারি ২০২৪, সকাল ১০টা। কয়েকটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে করে শতাধিক ব্যক্তি বাঁওড় পাড়ে নিয়ে এল প্লাস্টিকের ড্রামভর্তি পানি। হয়ত তাতে কিছু মাছের পোনাও ছিল। তারা উৎসাহের সাথে ড্রাম থেকে বাঁওড়ে পানি ঢেলে সদম্ভে ঘোষণা করলো 'এই বাঁওড়ে আজ থেকে কেউ মাছ ধরবি না- আজ থেকে এই বাঁওড় আমাদের।' এ যেন ক্ষমতা যার, জলাধার তার।

এর আগে তারা বাঁওড়ের দায়িত্বরত গার্ড ও বাঁওড়ের ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। হত্যার হুমকি দিয়ে মাছধরা ডিঙ্গি নৌকা কেড়ে নিয়ে মাছ লুটপাট করে।

দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর 'পানি ঢেলে' এভাবেই সরকারি ইজারাপ্রাপ্ত যশোরের চৌগাছা উপজেলার বল্লভপুর বাঁওড় দখলে নেয়ার চেষ্টা করে প্রভাবশালীরা। বেদখল হয়ে যাওয়া বাঁওড়ের ইজারাদার বল্লভপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সঞ্জয় কুমার রায়ের কাছ থেকে এই ঘটনার বর্ণনা মেলে।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনসহ নানান সুযোগ বুঝে ইজারা দেয়া বিল-বাঁওড়ে ক্ষমতাশালীরা দখলদারিত্বের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে। সঞ্জয়ের অভিজ্ঞতা সেসবের সবচেয়ে তাজা উদাহরণ। এমন দখলের ফলে সরকারি নিয়ম নীতি মেনে ইজারা নিলেও বঞ্চিত হয় প্রকৃত জেলেরা। এতে স্লোগানেই থেকে যায় 'জাল যার জলা তার'।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম জানান, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি- ২০০৯ এ বলা হয়েছে- প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোনো ব্যক্তি বা কোনো অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

প্রভাবশালীদের দখলদারিত্বের বিষয়ে মৎস্য কর্মকর্তা রফিকুল আলম বলেন, 'জলমহাল নীতিমালা অনুযায়ী 'সাবলিজ' দেয়ার নিয়ম নেই। আর ইজারাও হস্তান্তরযোগ্য নয়।' অথচ জবরদস্তিমূলক দখলের চর্চা চলে অহরহ, যার কোন প্রতিকার মেলে না।

- জাতীয় নির্বাচনের পর একদফা দখল হয়
- ৫ আগস্টের পর প্রেক্ষাপট ফের পাল্টেছে

ইজারাপ্রাপ্ত বিল বাঁওড়ের দখলদারিত্ব বিষয়ে বল্লভপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুমার রায় ও সাধারণ সম্পাদক তারক কুমার বিশ্বাসের কাছ থেকে জানা যায় তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা। তারা জানান, চৌগাছার সুখপুকুরিয়া ইউনিয়নের বল্লভপুরে সনাতন ধর্মাবিশ্বাসী প্রায় ৩১ পরিবারে দেড় শতাধিক প্রকৃত মৎস্যজীবী রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪ জন 'জেলে কার্ডধারী'। এ গ্রামে জেলেদের একশটিই সমবায় সমিতি রয়েছে। এই সমিতির মাধ্যমে ইজারা নিয়ে বল্লভপুর বাঁওড়ে মাছ চাষ করা হয়। কাগজে কলমে সমিতির নাম থাকলেও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা

তাদের পোষ্য দিয়ে মাছ চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, স্থানীয় নির্বাচনেও ক্ষমতা বদলালে জলাশয়ের মাছের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও রাতারাতি বদলে যায়।

অন্যদিকে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল ইজারা নীতিমালা অনুযায়ী সমিতির বাইরে কাউকে বাঁওড় 'সাবলিজ' দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক মদদপুষ্ট এলাকার একশটি চক্র বারবার জোরপূর্বক বাঁওড় দখল কিংবা 'সাবলিজ' নিতে চায়। সমিতি আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের মোকাবেলা করে আসছে বলে তিনি জানান।

তার ভাষ্যমতে, ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারির মতো গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে দেশত্যাগ করলে প্রেক্ষাপট ফের পাল্টে যায়। বল্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জিন্নাত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা আইজেল হক, কার্তিক বিশ্বাস, মিজানুর রহমান, গহর মল্লিক, শহর মল্লিক, শিপন হোসেন, সুকুমার বিশ্বাস, ছাবদার হোসেন, সোহরাব গাজীসহ অন্তত ৫৩জন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকর্মীর নেতৃত্বে বল্লভপুর বাঁওড়ের মাছ লুট শুরু হয়। ৬ আগস্ট সকালে তাদের নেতৃত্বে কয়েক গ্রামের শত শত মানুষ বাঁওড়ের মাছ লুট করে। টানা ৫দিনের লুটে আনুমানিক ৪০-৪৫ লাখ টাকার মাছ তুলে নেয় দুর্বৃত্তরা। ৫-১০ আগস্ট পর্যন্ত লুট ঠেকাতে রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের শরণাপন্ন হলেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে লুট বন্ধ হলেও নেতৃত্বদানকারী সন্ত্রাসীদের মাছ চুরি বন্ধ হয়নি। তাদের অব্যাহত হুমকিতে সমিতির সদস্য ও সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে চরম শঙ্কিত বলে জানান তিনি।

এর আগে বিগত ২১ জুন চাঁদা না পেয়ে প্রাণনাশের হুমকি এবং বাঁওড় দখলের চেষ্টা করেছে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। এসময় সমিতির সদস্যদের মাছ শিকারের জাল কেটে নষ্ট করে দেয় সন্ত্রাসীরা। এতে প্রায় ৭ লাখ টাকার জাল নষ্ট হয়।

যে কোনো সময় বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে এ আশঙ্কায় ২০ জুন চৌগাছা থানায় দুর্বৃত্তদের নাম উল্লেখ করে সাধারণ ডায়েরির (জিডি) আবেদন করেন বল্লভপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক তারক কুমার বিশ্বাস।

এ বিষয়ে চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইশবাল বাহার চৌধুরী বলেন, 'বাঁওড়টির বর্তমান ইজারাদাররা গত ২১ জুন সকালে মাছ ধরতে গেলে অন্য একশটি পক্ষ বাঁওড়ে আসে। এতে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যায়।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা বলেন, 'বর্তমান ইজারাদাররা ২১ জুন মাছ ধরবেন, এ মর্মে তারা লিখিত জানিয়েছিলেন। তারা মাছ ধরতে নামলে অপর পক্ষ বাধা দেয়। সেটা নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির হয়।'

এ বিষয়ে বল্লভপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুমার রায় বলেন, 'নবনির্বাচিত এক জনপ্রতিনিধির ইন্ধনে সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাদের অত্যাচারে আমরা চরম আতঙ্কে দিন পার করছি।'

অপরদিকে, মণিরামপুর উপজেলার হরিহরনগর ইউনিয়নের খাটুরা বাঁওড় দখল চেষ্টা করা হয়েছে। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন ধর প্রভাব বিস্তার করে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় এই দখলের চেষ্টা করেছেন। এ ঘটনায় কয়েকশ' মৎস্যজীবী বাঁওড় পাড়ে চলতি মাসের ১০ তারিখে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। বাঁওড়টি খাটুরা বাঁওড় মৎস্যজীবী সমিতির অনুকূলে রয়েছে। এই সমিতির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার বলেন, ইতঃপূর্বে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর অ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) সরকারের কাছ থেকে ৫০ বছরের ইজারা নেয়। পরবর্তীতে ইফাদ ওই বাঁওড় খাটুরা মৎস্যজীবী সমিতির নামে ডিড (চুক্তিনামা) করে দেয়। সেই থেকে মৎস্যজীবীরা মৎস্য চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন।

তিনি বলেন, 'হরিহরনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন কুমার ধর প্রভাব বিস্তার করে সরকারের কাছ থেকে তিন বছরের লিজ নেন। গত বছরের জুন মাসে লিজের মেয়াদ শেষ হলেও সরকারকে কোন খাজনা না দেয়ায় বাঁওড়টি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে মামলা করা হলে উচ্চ আদালতের নির্দেশে বাঁওড়টি পুনরায় মৎস্যজীবী সমিতির অনুকূলে আসে। কিন্তু রিপন কুমার ধর ভুয়া ডিড (চুক্তিনামা) করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর (২০২৪) স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের সহযোগিতায় বাঁওড়টি দখলের চেষ্টা করেন । এসময় মৎস্যজীবীসহ এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যান।'

এদিকে, এ অভিযোগ অস্বীকার করে রিপন কুমার ধর বলেন, সরকারের কাছ থেকে তিনি পুনরায় লিজ নিয়েছেন। তার এ দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাস বলেন, সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে বাঁওড় দখল করেছে।

চৌগাছার স্বরূপদাহ ইউনিয়নের তিন গ্রাম খড়িঞ্চা, মাধবপুর ও দেবালয়। এ তিন গ্রামের প্রায় ১৬২ পরিবারে ৬ শতাধিক মৎস্যজীবীর বসবাস। এদের মধ্যে ১৪৩ জনকে (যাদের মধ্যে ৯১ জন জেলে কার্ডধারী) নিয়ে গঠিত হয়েছে খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, যার সভাপতি ভরত কুমার বিশ্বাস জানান, খড়িঞ্চা বাঁওড়ের পরিমাণ ২৩৩ দশমিক ৭৪ হেক্টর। সরকারি নিয়মনীতি মেনে ৬২ লাখ টাকায় আগামী ছয় বছরের (১৪৩১-১৪৩৬ বঙ্গাব্দ) জন্য ইজারা নেয়া হয়েছে। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে এ বাঁওড়ে থাকা প্রায় আড়াই কোটি টাকার মাছ লুটপাট করে নিয়ে গেছে ক্ষমতাশালী দুর্বৃত্তরা।

যশোর জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ সরকারি বাঁওড় বলা হয় মণিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা বাঁওড়কে। ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাঁওড়ের তীরবর্তী ৩টি জেলেপল্লী রয়েছে। ৩টি জেলে পল্লী মিলে ১০০ ঘর বাসিন্দা রয়েছেন, যার সদস্য সংখ্যা ৬০০ জন। একে একে এই ৩টি জেলে পল্লীতে ৪টি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। এই ৪টি সমবায় সমিতির গঠিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ১১১ জন। এই ৩টি জেলে পল্লীর সবাই জেলে কার্ডধারী। সমিতির সদস্য হতে হলে তাকে অবশ্যই কার্ডধারী হতে হবে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির বাইরের কোনো জেলেকে এই বাঁওড়ে নামতে দেয়া হয় না- এমনটিই বললেন প্রভাস বিশ্বাস (৫০)।

তিনি জানান, চলতি মেয়াদে ৬ বছরের জন্য ঝাঁপা বাঁওড়ের ইজারা পেয়েছে 'মোবারকপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড'। তিনি যে সমিতির সদস্য সেটির নাম সোনার বাংলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড। তার সমিতির সদস্যদের এই বাঁওড়ে নামতে দেয়া হয় না, এমনকি কোন কাজেও (পাহারা ও জাল টানা জোন) নেয়া হয় না। তিনি বলেন, ইজারা প্রথা ভালো। তবে ক্ষমতার দাপটে এটা এখন কুক্ষিগত হয়ে গেছে। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত মৎস্যজীবীরা। তিনি বলেন- বিল-বাঁওড়ে সব জেলেই সমানভাবে প্রকৃতির মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে জেলে সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্ম এ পেশায় আসবে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জেলে সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্ম এ পেশায় আসতে আগ্রহী হচ্ছে না বলে তিনি জানান।

ঝাঁপা বাওড়ের ইজারাপ্রাপ্ত মোবারকপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন সাধন বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এক কোটি ২৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ৬০৫ দশমিক ৯১ হেক্টর আয়তনের ঝাঁপা বাঁওড় ইজারা নিয়েছি ৬ বছরের জন্য (১৪৩০-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ)। এতো টাকা কীভাবে জোগাড় করলেন জানতে চাইলে প্রথমে তিনি বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। এক পর্যায়ে স্বীকার করেন- বাইরের লোকদের কাছ থেকে এই টাকাটা ধার নেয়া হয়, পরবর্তীতে কিছু লাভ দিয়ে ফেরত দেয়া হয়। তার এই বক্তব্য আংশিক সঠিক। কারণ বাইরের এই লোকরাই মূলত বাঁওড়ের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায় মৎস্য চাষি (জেলে নয়) শহিদুল ইসলামের কাছ থেকে।

শহিদুল ইসলাম (৫৫) একজন মৎস্য চাষি। বাড়ি মণিরামপুরের চাকলা গ্রামে। বসবাস করেন যশোর শহরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকার ঘের, বাঁওড়ে অংশীদার ভিত্তিতে মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তিনি তার নিজ এলাকার কৃষকদের মাঠের বিলের জমি বাৎসরিক চুক্তিতে লিজ নিয়ে ঘের করে মাছ চাষ করছেন। এছাড়া যশোরের বিভিন্ন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী এমনকি কিছু গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ বাঁওড়ে মাছ চাষে অর্থলগ্নি করেছেন। এই বাঁওড়টির স্থানীয় একাংশ জেলেদের নামে ( মোবারকপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড) ইজারা নেয়া। তার মতো আরো কয়েকজন রয়েছেন এই বাঁওড়ে অর্থ লগ্নিকারী।

তিনি বলেন, 'আমাদের মতো ব্যবসায়ীরাই মূলত বিভিন্ন বাঁওড় তীরবর্তী জেলেদের দিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন। একশটি সমবায় সমিতি গঠন করা থেকে শুরু করে বাঁওড়ের ইজারা প্রাপ্তি পর্যন্ত যাবতীয় খরচ আমরাই করি। যে কারণে বাঁওড়ের সুবিধাও আমরাই ভোগ করি। তাছাড়া ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির সদস্যদের আমরা বিমুখ করিনা। তাদের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া হয়। তবে সেটার পরিমাণ খুব সামান্যই বলা চলে।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কেশবপুর, শার্শা, চৌগাছার বিল-বাঁওড় ইজারা কেন্দ্রিক কয়েকজন অর্থলগ্নীকারী এমন অভিন্ন বক্তব্য দেন।

পর্ব: ০৩

# বঞ্চিত জেলেরা মাছ খোঁজেন নালায়, কাজ খোঁজেন ডাঙায়

'...কেউ না জানুক কার কারণে- কেউ না জানুক কার স্মরণে মন পিছু টানে.... তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে- তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে...' শিল্পী পার্থ বড়ুয়ার গাওয়া এ গানের কথাগুলো যেন এভাবেই বললেন মৎস্যজীবী ৩৫ বছরের মহাদেব তরফদার।

যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের জগহাটি বাঁওড় পাড়ের সরকারি খাস জমিতে বসবাস করেন মহাদেব। সকাল থেকে দুপুর অবধি বিভিন্ন মাঠে ঘুরতে ঘুরতে এক নালায় (ছোট খাল) ৮০০ গ্রাম ওজনের ৩টি আইড় মাছ পেয়েছিলেন তিনি। সেগুলো ২৭০ টাকায় এ প্রতিবেদকের কাছে বিক্রি করে দেন। এ টাকা দিয়েই স্ত্রী, দুই ছেলে, মাসহ ৫ জনের সংসারের খরচ চলবে তার। এভাবে প্রতিদিন তিনি বাড়ি থেকে বের হন মাছ ধরতে। কোনোদিন এক কেজি হয়, কোন দিন আধা কেজি, আবার কোনোদিন হয় না। এভাবে বহু কষ্টে দিন গুজরান করতে হয় তাকে।

নিদারুণ কষ্টের জেলে জীবন ছাড়তেও পারেন না মহাদেব; বলেন 'আমরা মাছ ধললিও (ধরলেও) জাইলে (জেলে), বাজারেরতে (বাজার থেকে) কিনে আইনে বেচলিও জাইলে। মার প্যাটেততে

(পেট থেকে) পড়ে আরতো কিছু শিখিনি, তাই এই কাজ কইরেই (করেই) খাতি (খেতে) হবে।' তিনি জানান-জগহাটি বাঁওড়টি তাদের সমিতি 'জগহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি'র নামে ইজারা নেয়া হলে দখল করে রেখেছেন স্থানীয় চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের লোকেরা জেলেদের বাঁওড়ে নামতে দেয় না। তাই প্রতিদিন এভাবে জাল নিয়ে বের হন, যা মাছ পান সেগুলো বিক্রি করেই সংসার চালান। ছেলে মেয়েদের ভাগ্যে এই মাছ খাওয়া জোটে না।

একই কথা বলেন মৎস্যজীবী অশোক (৩৮)। তিনি জানান-বরাবরই চেয়ারম্যানের লোকেরা জগহাটি বাঁওড়টি দখল করে রাখে, তাদের বাঁওড়ের পানিতে নামতে দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে প্রতিদিন জাল ঘাড়ে নিয়ে বের হন। বিভিন্ন বদ্ধ জলাশয়ে জাল ফেলে যা মাছ পান সেগুলো বিক্রি করে সংসার চলে তার। তিনি বলেন-'যেদিন থেকে ইজারা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই আমাদের

কপাল পুড়েছে।' সংসারের খরচ জোগাতে যেয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়াও ঠিকমতো শেখাতে পারেন না বলে এ প্রতিবেদককে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন- 'মাছ না পেলে বিল-খাল থেকে কুঁচে-কাঁকড়া ধরে এনে বিক্রি করে সংসার চালাই। আবার অন্যের ক্ষেত খামারে কাজ করেও সংসার চালাতে হয়। আমাদের বাড়ির মহিলারাও এখন বাইরে ক্ষেত খামারে কাজ করে।'

একই কথা বলেন মুকুল (৩৫)। তার ৩ ছেলে, স্ত্রীসহ ৬ জনের সংসার। তিনি ও তার স্ত্রী অন্যের ক্ষেতে কাজ করেন। ৩ ছেলে ছোট, ইনকাম করার মতো এখনো হয়নি। স্বামী-স্ত্রী মিলে মাসে ৫/৬ হাজার টাকা আয় করেন, এটা দিয়েই তাদের সংসার চলে।

একইভাবে মাঠে ক্ষেত খামারে পুরুষের মতো কাজ করেন জরিবালা (৪৫), কালীদাসি (৪০) ও বাসন্তী (৪২)। তারা বলেন, স্বামীরা বাড়ির সামনে বাঁওড়ে নামতে পারেন না। আশপাশের বিল এলাকায় ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে যে টাকা আয় করেন তাতে আমাদের সংসার এখন আর চলে না, তাই আমরাও মাঠে কাজ করে সংসারে সাহায্য করি। জেলে কার্ড আছে কিনা? জানতে চাইলে প্রতি পরিবারের অন্তত এক জনের আছে বলে তারা জানান। কিন্তু এ কার্ড দিয়ে সরকারি কোনো সহায়তা তারা পান না। প্রায় সকলেই অভিন্ন ভাষায় বলেন-'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে, কেউ খবর নেয় না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছি না। সরকার থেকে একটা জেলে কার্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো দিন এ কার্ড থেকে কোনো ধরনের সহায়তা পেলাম না।'

জেলে কার্ড এবং এর সুবিধা পাওয়া না পাওয়া বিষয়ে জানতে চাইলে চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার আনিছুর রহমান বলেন-'আমার ইউনিয়নে দুই/তিন জায়গায় জেলে রয়েছে। এদের প্রত্যেকটি পরিবারের অন্তত একটি করে জেলে কার্ড রয়েছে এটা আমি জানি। আমি ১০ বছর এই ইউনিয়নে মেম্বারের দায়িত্ব পালন করেছি। এই সময়ে এরা কোন সুবিধা পায়নি। অনেক কষ্টে এখানকার জেলেদের দিন পার করতে হয়।'

তিনি আরও বলেন-'আমার ইউনিয়নের জেলেরা কাগজ কলমে তাদের সমিতির মাধ্যমে বাঁওড়ের ইজারা পায় ঠিকই কিন্তু বাঁওড়ে তাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। স্থানীয় প্রভাবশালীরা বাঁওড় নিয়ন্ত্রণ করেন। জেলেরা 'জোন' হিসেবে বাঁওড়ে নামতে পারেন মাত্র। এখানকার মাছও তাদের ভাগ্যে জোটে না।' তিনি জানান-তার গ্রামেই অন্তত ৩০০ পরিবার জেলে রয়েছে। তাদের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদ। এই নদেই তারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এখন আর এই নদে কোনো মাছ হয় না। 'পট' জমে নদে নামার কোনো উপায় নেই। কয়েক যুগ ধরে এভাবে চলছে। ফলে এখানকার জেলেরা সবাই অন্য পেশায় চলে গেছে।

অন্যদিকে, যেসব জেলে বাঁওড়ে ইজারা পাওয়া জেলে দলের বাইরে থাকেন, তাদের বেশিরভাগ ব্যক্তি মালিকানার জলাশয়সহ ইজারাপ্রাপ্ত বাঁওড়-বিলে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

যশোর জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ সরকারি বাঁওড় বলা হয় মণিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা বাঁওড়কে। প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাঁওড়ের তীরবর্তী ৩টি জেলেপল্লী রয়েছে। ৩টি জেলে পল্লী মিলে ১০০ ঘর বাসিন্দা রয়েছেন, যার সদস্য সংখ্যা ৬০০ জন। তাদের একজন ৫০ বছর বয়সী প্রভাস বিশ্বাস। তিনি জানান, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির বাইরের কোনো জেলেকে এই বাঁওড়ে নামতে দেয়া হয় না। তাই বাধ্য হয়ে তার মত বহু জেলেকে নিজের পেশার বাইরে কখনো অন্যের ধান-পাটের জমিতে, কখনো সবজির ক্ষেতে জোন (দিনমজুর) বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম জানান, মাছ ধরার পাশাপাশি বহু জেলে কৃষি, দিনমজুরি, জাল এবং মাদুর তৈরির মতো কাজ করে আয় করতে বা আয় বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

পর্ব: ০৪

# জন্মগতভাবে জেলে তবে পেশায় নেই অনেকেই

আনন্দ মোহন বর্মণ, বয়স ৬৫ বছর। দুই ছেলের জনক। বাড়ি যশোর শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে চাঁচড়া বর্মণ পাড়ায়। এই পাড়ার সবাই জেলে সম্প্রদায়ের। ৫০০ ঘর জেলের বসবাস এখানে। এই পাড়ার নদিয়ার মোড়ে তার একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। দুই ছেলেই সরকারি চাকরি করেন। বড় ছেলে ব্যাংকার, ছোট ছেলে সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তিনি নিজেও চাকরি করতেন, এখন অবসরে আছেন। তার পূর্ব পুরুষরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পূর্ব পুরুষের পেশা বদলের কারণ জানতে চাইলে তিনি ছোট একটি ইতিহাস শোনান।

তিনি জানান, তার ঠাকুরদা (বাবার বাবা) প্রয়াত রজনি কান্ত ছিলেন চাঁচড়া রাজবাড়ির একজন গুণি বাদ্যকার। যে কারণে রাজ পরিবারের সদস্যদের কাছে তার কদরটাও ছিল একটু ভিন্ন। অবাধে যাতায়াত ছিল রাজ পরিবারের মধ্যে। রাজা বরদাকণ্ঠ (বেদকণ্ঠ) তাকে একটু আলাদা দৃষ্টিতে দেখতেন। রানীও তাকে ভালোবাসতেন। বাড়ির পাশের মুক্তেশ্বরী নদী ও হরিণার বিল থেকে জ্যান্ত মাছ ধরে এনে রাজপরিবারে বিক্রি করতেন।

তিনি বলেন, 'আমার বাবাও মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেক কষ্ট করে সংসার চালিয়েছেন; আবার আমাকে লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। এরপর আমি চাকরি করেছি, ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছি, তারাও এখন চাকরি করছে।'

শুধু আনন্দ মোহন বর্মণই না, সমগ্র যশোর জেলাতেই জেলেপল্লীগুলোতে এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। সবাই চাইছে তাদের সন্তানরা অন্য কোনো পেশা বেছে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করুক।

দিপংকর বর্মণ যশোর সরকারি এমএম কলেজের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। পড়ালেখার পাশাপাশি কম্পিউটার শিখে এখন যশোরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম চাকরি করেন। এখানে যে বেতন পান তা দিয়ে নিজের খরচের পাশাপাশি সংসারেরও ব্যয়ভার বহন করেন।

তার মতো আর কেউ লেখাপড়া বা চাকরি করেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, তার সমবয়সী অনেকেই আছেন যারা বিএ, এমএ পড়ছেন, অনেকেই চাকরি করছেন। এই গ্রামে একজন সচিব ও একজন ইউএনও রয়েছেন। এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, এমএ পাশ রয়েছেন অনেকেই। অদূর ভবিষ্যতে এই গ্রামে আর জেলেই থাকবে না বলে যোগ করেন তিনি।

জেলে পেশা ছেড়ে কেন সবাই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে জানতে চাইলে তিনি গ্রামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের কাছে নিয়ে যান। নাম তার গুরুদাস বর্মণ, বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই। তার বাড়িতে গেলে দেখা যায় তিনি পাশেই স্কুল মাঠে রোদে 'বটকে জাল' (বড় জাল) শুকাচ্ছেন।

দীর্ঘ আলাপচারিতায় বর্মণ বলেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে এ দেশে বংশ পরম্পরায় জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। জেলেরা যেখানে বসবাস করেন, সে জায়গাকে বলা হয় 'জেলেপল্লী' বা 'জেলেপাড়া'। একটা সময় ছিল যখন মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত

জালও এই জেলেরাই বুনত। এখন সব বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, মাছ শিকারে জেলেদের অতিপ্রয়োজনীয় নৌকা তৈরি হতো জেলেপাড়ার ভেতরেই। এই নৌকা তৈরির ব্যাপারটা নির্ভর করত নিকটবর্তী নদীর আকার, পানিপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, নৌকা ব্যবহারের উদ্দেশ্য, গাছের প্রাপ্যতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর।

মাছ ধরার কৌশলগত ধরন এবং ঋতুভেদে জেলেদের আয়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। শুকনা মৌসুমের তুলনায় ভরা মৌসুমে মাছের উৎপাদন বেশি হয় বলে জেলেদের আয়ও বেড়ে যায়। যখন নদীতে মাছের প্রাপ্যতা কমে যেত, তখন জেলেরা নদীপথে পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত হতো।

তিনি বলেন, এখন শুধু জন্মগতভাবে জেলেই আছে, পেশায় নেই অনেকেই।

কারণ হিসেবে বলেন, এখন আর বিল-খালে পানি থাকেনা, মাছও হয় না। যখন পানি হয় তখনও সেখানে মাছ মারা যায় না। বিলগুলোতে এখন পুঁজিপতিরা ঘের করে মাছ চাষ করার কারণে জাল দিয়ে মাছ ধরার কোন সুযোগ মেলে না।

বাড়ির পাশে মুক্তেশ্বরী (উন্মুক্ত নদী) নদীতেতো মাছ ধরতে পারেন, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাকে কোটি টাকা দিলেও আমি ওই নদীতে নামবো না; এমনকি কেউ নামবে না, কারণ এই নদীতে 'গাদ' জমে পানি নষ্ট হয়ে গেছে, এখানে মাছ হয় না।

তিনি জানান, তার ৩টি 'বটকে জাল' রয়েছে, এই ৩টি জাল তিনি ঘের মালিকদের কাছে দিন ২০ টাকা হিসেবে ভাড়া দেন, নিজেও সাথে 'জোন' হিসেবে যান ৪০০-৫০০ টাকা হাজিরায়। এভাবে যা আয় হয় তা দিয়েই তাকে সংসার চালাতে হয়। এভাবেই ডাল-ভাত খেয়ে জীবন চলে তার। কত বছর ধরে এই অবস্থা চলছে জানতে চাইলে তিনি বলেন-৩০-৩৫ বছর মতো হবে।

একই কথা বলেন ওই গ্রামের প্রবীর, ধনঞ্জয় বর্মণরা। তারাও জাল ভাড়ার সাথে নিজেরা 'জোন' হিসেবে কাজে যেয়ে যে টাকা আয় করেন তা দিয়েই সংসার চালান। তারা জানান, কতোদিন বিলে-খালে নিজেরা জাল ফেলে মাছ ধরেননি তা বলতে পারবেন না।

তারা বলেন, নদী প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মুক্তেশ্বরী এখন 'হাবড়ে' পরিণত হয়েছে। এ নদীর সংযোগ ২৭টি বিলের সাথে। এখানে মাছ হলে পাশের গ্রামের মানুষগুলো মাছ মেরে সুখে থাকতো।

মণিরামপুরের ঝাঁপা বাঁওড় পাড়ের রাজবাড়ি জেলে পাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির বারান্দায় বসে জাল বুনছেন রেখা বিশ্বাস (৪০)। স্বামী প্রভাষ বিশ্বাস পরের ক্ষেতে কাজ করতে গেছেন। দুই ছেলে মেয়ের জনক-জননী তারা। ছেলে শুভ বিশ্বাস যশোর পলিটেকনিক কলেজে ডিপ্লোমা শেষ বর্ষের ছাত্র। আর মেয়ে বর্ষা বিশ্বাস পার্শ্ববর্তী মশ্মিমনগর কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। একমাত্র ছেলেকে পড়ালেখা করাচ্ছেন যেন চাকরি করে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

সমগ্র যশোর জেলার জেলে পল্লীতেই বর্তমান প্রজন্মের মাঝে পেশা বদলের শক্তিশালী ঢেউ লেগেছে। নতুন প্রজন্ম জীবিকার অনিশ্চয়তা থেকে বের হতে চায়, সমাজে আরও বহু মানুষের মত অবহেলাহীন জীবন চায়।

শেষ পর্ব

# যশোরে মামলা জটিলতায় ১০ বাঁওড়

## বছরে রাজস্ব ক্ষতি প্রায় অর্ধকোটি টাকা

১৯৮৭ সালের দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৩টি বাঁওড় সরকারের কাছ থেকে ৫০ বছর মেয়াদে লিজ নেয় 'ইফাদ বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে একটি বিদেশি কোম্পানি। বাঁওড়গুলোর অবস্থান যশোর, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নওগাঁয়। এরমধ্যে যশোরের ছিল ১২টি বিল বাঁওড়। ইফাদ কোম্পানি যশোরের বাঁওড়গুলো স্ব স্ব এলাকার জেলেদের মধ্যে ৫০ বছর মেয়াদে 'সাবলিজ' প্রদান করে কোন প্রকার টাকার লেনদেন ছাড়াই। এরা প্রত্যেক এলাকায় জেলেদের প্রকল্পভিত্তিক ১০/১২ জনের একেকটি গ্রুপ করে মাছ চাষে সহযোগিতা করতো। জেলেরা সবাই ছিল ইফাদ প্রকল্পের সদস্য। তারা কোন টাকা নিত না আবার দিত না। এই সময়টাতে বাইরের লোকেরা এই বাঁওড়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। কারণ ওই ইফাদ কোম্পানি বাঁওড়গুলো সরাসরি দেখাশুনা করতো। ফলে জেলেরাও বেশ লাভবান হতেন।

পরবর্তীতে ২০০৪-০৫ সালের দিকে ভূমি মন্ত্রণালয় ইফাদ কোম্পানির সাথে চুক্তি বাতিল করলে তারা প্রকল্প গুটিয়ে নিয়ে চলে যায়। এরপর জেলেরা সরকারকে প্রতিবছর ১০ শতাংশ বেশি হারে খাজনা দিয়ে বাঁওড় পরিচালনা করে আসছিলেন। এসময় স্থানীয় প্রভাবশালীরা বাঁওড় দখল নিতে নানাভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। জেলেদের সাথে বাঁওড় দখল- বেদখলের ঘটনাও ঘটতে থাকে। একপর্যায়ে ২০০৯ সালে সরকার একটি নীতিমালা তৈরি করে বাঁওড়গুলো ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ নিলে জেলেদের সাথে সরকারের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। জেলেদের ভাষ্য-ইফাদ কোম্পানির সাথে তাদের চুক্তি ৫০ বছরের। যেহেতু চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়নি, তাই এর আগে কোনো ইজারায় তারা যাবেন না। এক পর্যায়ে ২০১২ সালে চৌগাছার সরকারি চাকলা বিল পাড়ের জেলেরা সংঘবদ্ধ হয়ে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দেন।

যশোরের মণিরামপুরের চালুয়াহাটি গ্রামের বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম মিলন (৫৫) দীর্ঘদিন ধরে যশোরের বিভিন্ন এলাকার জেলেদের সাথে যোগসাজশে বাঁওড়ে মাছ চাষ করেন। 'ভুয়া' কার্ডধারী জেলেদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বর্তমানে বাঁওড়কেন্দ্রিক জেলেদের যে-সব সমবায় সমিতি রয়েছে, তার সদস্যদের একটি বড় অংশ প্রকৃত জেলে না। যে-সব প্রভাবশালী নেপথ্যে থেকে বাঁওড় চালান মূলত তারাই স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের ম্যানেজ করে সাধারণ ব্যক্তিদের (জেলে নন) নামে জেলে কার্ড করে দিয়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য করে বাঁওড় ইজারা নেন।'

এদিকে, হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় যশোরের ১০টি বাঁওড় ২০০৯ সালের নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা দিতে পারছে না সরকার। বাঁওড় ইজারা দিতে না পারায় সরকার কয়েক লাখ টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঝিকরগাছার কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাঁওড় সমিতির সভাপতির কাছে চলতি মেয়াদে কত টাকা ইজারা দিয়েছে সে ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের পূর্বের বছরের ইজারা মূল্যের সাথে ১০% যোগ করে যা হয় সেই টাকাটা দিতে হয়। সেই হিসেবে চলতি মেয়াদে (৩ বছর) তাদের ইজারা দিতে হয়েছে ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা, এর সাথে ভ্যাট বাবদ ১৫% যোগ করে ৪৬ হাজার ৭০০ টাকা এবং আইটি বাবদ ৫% যোগ করে ২৩ হাজার ৩৫০ টাকা, সর্বমোট ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫০ টাকা সরকারি খাতে দিতে হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, ' বর্তমান সরকারি নীতিমালা মেনে ইজারা নিলে ইজারা মূল্য আরও কয়েক গুণ বেশি হতো।'

আদম আলীর হিসেব অনুযায়ী মামলা চলমান থাকা ১০টি বাঁওড় থেকে সরকার প্রতিবছর অন্তত ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু এই ১০টি বাঁওড়ই নয়; সরকারিভাবে ইজারা প্রদানকৃত ৩৬টি বাঁওড়ের অধিকাংশতেই ঝুট-ঝামেলা এবং স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়েরের ঘটনা ঘটে অহরহ। এইসব মামলায় পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আগেই স্থানীয় প্রভাবশালীরা বিশেষ করে বাঁওড়ের দখলদাররা পুলিশ ম্যানেজ করে মামলার বাদী-বিবাদীদের ডেকে মীমাংসা করেন নেন।

কেশবপুরের মর্শিনা বাঁওড় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুইপক্ষে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। ২০২০ সালে যশোর জেলা প্রশাসন এই বাঁওড়ের জমির মধ্যে থেকে ৩৩.৩১ একর জমি জাহানপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে ইজারা দেয়। এরপর থেকে বাঁওড়ের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে জাহানপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি অপূর্ব সরকার গ্রুপের সাথে বিরোধ চলতে থাকে সাধারণ সম্পাদক রাজ কুমার সরকার গ্রুপের। এরই জের ধরে ২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি দুইপক্ষে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ওই দিনই মৎস্যজীবী সমিতির পক্ষে অপূর্ব সরকার থানায় একটি অভিযোগ দাখিল করেন। যদিও সেই মামলার ভবিষ্যৎ আর আলোর মুখ দেখেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, মামলাটি পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যস্থতায় মীমাংসা করে নেওয়া হয়েছে।

যশোর সদরের ইছালী ইউনিয়নের কায়েতখালী বাঁওড়টি ২০২৩ সালের ২৮ জুন জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করে স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি। এসময় তারা বাঁওড় থেকে মাছ লুট ও নেট পাটা অপসারণ করে ক্ষতিসাধন করে। এ ঘটনায় ৩ জুলাই বাঁওড়ের সভাপতি আসানুর রহমান বাদী হয়ে যশোর কোতয়ালি থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপে মীমাংসা করে নেওয়া হয়েছে।

একইভাবে যশোরের চৌগাছার কুলিয়া বাঁওড় নিয়ে স্থানীয় দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বাওড়ের মালিকানা নিয়ে বিএনপি সমর্থিত ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত আবু হাসান ইকবালের ওয়ারিশ ঝড়ু, মিকাইল, মিলন ও চৌগাছার কুলিয়া গ্রামের মৃত আজিবর রহমানের ছেলে রওশন গংদের প্রকৃত

মৎস্যজীবীদের সাথে কয়েক দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এ নিয়ে একাধিক মামলাও হয়েছে। এরমধ্যে একটি মামলার বাদী জামাল হোসেন এ প্রতিবেদককে জানান, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এলে ঝিনাইদহের মহেশপুর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম মাস্টার ও যশোরের ঝিকরগাছা-চৌগাছা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুহাদ্দিস আবু সাঈদ নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে তার বাবাকে দিয়ে প্রকাশ্যে কুলিয়া স্কুল মাঠে স্বাক্ষর নিয়ে মামলা প্রত্যাহার করিয়ে নেন।

যশোর জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মহামান্য হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় ১০টি বাঁওড় ইজারা দেওয়া হয়নি। এগুলো হলো- চৌগাছা উপজেলার চাকলা বিল (২৭ দশমিক ১০ একর) ২০১২ সাল থেকে ৭২৭৬/২০১২ নং মামলা চলমান। ঝিকরগাছা উপজেলার কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাঁওড় (৫৩ দশমিক ৩৫ একর), উজ্জ্বলপুর বাঁওড় (৬৩ দশমিক ৭৫ একর), মণিরামপুর খেদাপাড়া বাঁওড় (১৪১ দশমিক ২০ একর), খাটুরা বাঁওড় (১৬০ দশমিক শূন্য ৮ একর), অভয়নগর উপজেলার পুড়াখালি বাঁওড় (১৩৪ একর), শার্শা উপজেলার বাহাদুরপুর বাঁওড় (২৯৯ দশমিক ১২একর), রাজগঞ্জ বাঁওড় (৯৩ দশমিক ৫০ একর) ২০২০ সাল থেকে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন- ৪৮৪৩/২০২০ নং মামলা চলমান। এছাড়া কন্যাদহ বাঁওড় (৯৩ দশমিক ৫০ একর) এবং যশোর সদর উপজেলার বুকভরা বাঁওড় (৩৭৮ দশমিক ৬৫ একর) ২০২১ সাল থেকে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন- ৪৫৩৬/২০২১ নং মামলা চলমান।

যশোর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এসএ শাখার উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবুল হোসেন বলেন, মামলা জটিলতায় মোট এক হাজার ৪৪৪ দশমিক ২৫ একর জলাশয় ইজারা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

যশোর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সুজন সরকার বলেন, ‘কোনো জলমহাল নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান থাকলে ওই মামলা যে পর্যায়ে প্রত্যাহার অথবা নিষ্পত্তি হবে, সে পর্যায়ে ইজারা প্রদান করা হবে অথবা মামলায় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোন আদেশ থাকলে সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।’

গ্রুপ-৩

# যশোরে বৈচিত্রময় আয়ে নারী

দেওয়ান মোর্শদ আলম ও এম. আইউব

# লেখক পরিচিতি

## দেওয়ান মোর্শেদ আলম

দেওয়ান মোর্শেদ আলম মাধ্যমিকে পড়ার সময় সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় আগ্রহী হন। ১৯৯১ সালে সাপ্তাহিক ঝিনেদা বার্তায় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়। ১৯৯৩ সালে সরগম ম্যাগাজিনে যোগ দিয়ে পরে ব্যুরো প্রধান হন। তিনি দৈনিক স্ফুলিঙ্গ, দৈনিক কল্যাণ ও দৈনিক গ্রামের কাগজে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। পিআইবি, টিআইবি, বিবিসিসহ বিভিন্ন সংস্থার সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নজরুল চেতনার প্রতিষ্ঠান অগ্নিবীণার সাধারণ সম্পাদক, যশোর প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্যচর্চায় তার গণসংগীত গ্রন্থ, কবিতা ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্স করেছেন।

## এম. আইউব

এম. আইউব ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময় শখের বসে সাংবাদিকতা শুরু করেন। দৈনিক পূরবীতে শিক্ষানবিশ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিয়ে এক বছর পর স্টাফ রিপোর্টার হন। ১৯৯৯ সালে সাপ্তাহিক গ্রামের কাগজে যোগ দিয়ে পরবর্তী সময়ে দৈনিক সংস্করণে সাবএডিটর হিসেবে কাজ করেন। ২০০৩ সালে দৈনিক রানারে এবং ২০০৫ সালে দৈনিক পূর্বাঞ্চলে যোগ দেন, যেখানে ১০ বছর যশোর আঞ্চলিক অফিস প্রধান ছিলেন। ২০১৬ সালে দ্বিতীয়বার গ্রামের কাগজে ফিরে আসেন এবং বর্তমানে যুগ্ম বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন।

পর্ব: ০১

# এক সারে দু'কাজ, প্রসাধনী, চুঁইঝালে বিপ্লব

বিস্তৃত কৃষি খাতের কয়েকটি ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে যশোরের নারীদের অবদান গর্ব করার মতো। গ্রামের কাগজের তথ্যানুসন্ধানে অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্র বেরিয়ে এসেছে, যেখানে যশোরের নারীরা বিগত আড়াই দশকে দেশের কৃষির জন্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছেন। যা অনুসরণযোগ্য হয়েছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাছে। এরমধ্যে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় চুঁইঝাল চাষে প্রচলিত ধারণা ও চর্চায় পরিবর্তন আনা; পরিবেশবান্ধব কলম ব্যবহার শেষে ফেলে দিলে চারা গাছের উৎপাদন; দেশজুড়ে জনপ্রিয় ভার্মি কম্পোস্ট সারের প্রবর্তন; কীটনাশকের পৃথক ব্যবহার বন্ধে 'ট্রাইকো কম্পোস্ট' নামে আরেকটি জৈব সারের প্রবর্তন; ঝরে পড়া ফুলের পাপড়ি থেকে প্রসাধনী তৈরির পথ প্রদর্শন।

## এক কলমে তিনটি জাদু

আশির দশকে দেশে কালির কলমের জায়গা দখল করতে শুরু করে বলপেন। তখন একটি ব্র্যান্ডের বলপেনের বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল 'এক কলমে মাইল পার।' যশোরের একজন নারী এমন একটি কলম উদ্ভাবন করেছেন যার তিনটি গুণ আছে-একইসাথে লেখা যায়, ব্যবহারের পর ফেলে দিলে দ্রুত মাটির সাথে মিশে যায়, অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব এবং মাটিতে মিশতে মিশতে কলমটি থেকে গাছের চারা বের হয়, কারণ কলমের মধ্যে বীজ থাকে। তাই মজা করে এটিকে অনেকে 'জাদুকরী' কলম বলে।

এই কলমের উদ্ভাবক যশোরের নারী নাছিমা আক্তার। চল্লিশ বছর বয়সী নাছিমা সর্বপ্রথম ২০১৬ সালে রঙিন কাগজ দিয়ে কলম তৈরি করে দেশজুড়ে হইচই ফেলে দেন। দু'সন্তান আর স্বামী নিয়ে থাকেন যশোর শহরের লোন অফিসপাড়ায়। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ পান তিনি। নাছিমা আক্তারের বিশেষ স্বভাবের মধ্যে রয়েছে নতুন নতুন কিছু করা। কোনোকিছুতে থেমে না থাকা তার বৈশিষ্ট্যের একটি।

২০১৬ সালে কাগজের কলম তৈরির চিন্তা আসে নাছিমার মাথায়। রঙিন কাগজ দিয়ে কিছু কলম তৈরি করেন। কিন্তু সেগুলো বাজারে চলেনি। এ কারণে বন্ধ করেন কলম তৈরি। ২০১৯ সালের জুন মাসে সংসারে অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করলে ফের কলম তৈরির সিদ্ধান্ত নেন অদম্য এই নারী। এবার আর বাজারে বিক্রি না করে ১০০টি কলম নিয়ে সর্বপ্রথম যান শহরের কাছাকাছি যশোর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। প্রধান শিক্ষককে কলমগুলো দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রির অনুমতি চান তিনি। প্রধান শিক্ষক কাগজের কলম দেখে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রির অনুমতি দেন।

সেই থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তার। প্রতিনিয়ত বেড়েছে নাছিমার কাগজ দিয়ে তৈরি কলমের চাহিদা। একপর্যায়ে কাগজ দিয়ে তৈরি কলমের পেছনের অংশে বিভিন্ন ধরনের বীজ দেয়ার চিন্তা করেন তিনি। এই চিন্তা ইংরেজিতে অনার্স পড়ুয়া মেয়ে রেবেকা তার মাথায় ঢোকান। তিনি দেখেন কাগজের কলম তৈরির পর পেছনের অংশে খানিকটা ফাঁকা থাকে। প্রথমদিকে, টুকরো কাগজ দিয়ে ফাঁকা অংশ ভরাট করে দিতেন। পরে মেয়ের পরামর্শে কলমের ফাঁকা অংশে লালশাকের বীজ দেয়া শুরু করেন। এরপর থেকে পেয়ারা, টমেটো, মরিচ, বেগুন, লালশাক, ডাটাশাকসহ বিভিন্ন ফল ও ফুলের বীজ দিচ্ছেন ভিন্নধর্মী এই নারী উদ্যোক্তা। তিনি বলেন,'কলমের কালি শেষ করে মাটিতে পুঁতে দিলে সেখান থেকে গাছের চারা জন্মাবে।

কাগজ দিয়ে কলম তৈরি করে নাছিমা নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন, আরও অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ক্রেতারা চাইলে তাদের পছন্দের বীজ দিয়ে কলম তৈরি করে দেন নাছিমা। কলম তৈরির পরিত্যক্ত কাগজ দিয়ে ফুলদানি, অ্যাশ ট্রেসহ বিভিন্ন কুটির শিল্পের পণ্যও তৈরি করে নাছিমার কর্মী বাহিনী।

কাগজের তৈরি কলমের দাম সবার নাগালের মধ্যে রাখছেন নাছিমা। বীজযুক্ত কলম খুচরা ১৫ টাকা, আর বীজ বাদে ১০ টাকা। গড়ে একদিনে এক হাজার কলম তৈরি করেন। এরমধ্যে বীজযুক্ত ৭০০টি এবং বীজ ছাড়া ৩০০টি। মাসে তিন লাখ টাকার বেশি বীজযুক্ত কলম বিক্রি হয়। আর বীজ ছাড়া কলম বিক্রি হয় ৯০ হাজার টাকার।

## চুঁইঝাল চাষে নতুন ধারা এনেছেন সোনিয়া

চুঁইঝাল চাষ করা নারীদের একজন সোনিয়া খাতুন। বাড়ি যশোর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে। পাঁচ বছর আগে শুরু করেন চুঁইঝালের চাষ। প্রথমে তিনি শখের বশে তিনটি চারা দিয়ে শুরু করেন। এখন তার বাগানে এক হাজার ৫০০ চুঁইঝালের গাছ রয়েছে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক টাকার চুঁইঝাল বিক্রিও করেছেন তিনি। আগামী পাঁচ বছর পর একসাথে ৫০ লাখ টাকার চুঁইঝাল বিক্রি করার স্বপ্ন দেখছেন এই নারী। তিনি এ বছর নতুন করে মাটিতে চুঁইঝাল চাষের উদ্যোগ নেন। সেই লক্ষ্যে শুরু করেছেন মাটিতে চুঁইঝাল লাগানো। এসব কাজে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করছেন তার স্বামী।

চুঁইঝালের চাষ নিয়ে সোনিয়ার সাথে কথা বলতে চাইলে স্বামী আহাদ আলী নিজেই কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,'অনেক আগেই বাবা মারা যান। তখন আমরা খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ি। বাবার রেখে যাওয়া জমিতে কিছু করা যায় কিনা সেটি নিয়ে আমরা চিন্তা করতে থাকি। আমার স্ত্রী তখন চুঁইঝাল চাষের কথা বলে। বাড়িতে থেকে এটি করা একজন নারীর পক্ষে সম্ভব বলে জানায়। একপর্যায়ে আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে চুঁইঝালের তিনটি চারা সংগ্রহ করি। এভাবেই শুরু।'

সাড়ে তিন বিঘার বাগান ঘুরে দেখা যায়, অসংখ্য মেহগনি, কাঁঠাল, নারকেল, জলপাই, সুপারি, আম গাছ রয়েছে। প্রতিটি গাছে তিন থেকে ছয়টি চুঁইগাছ উঠেছে লতিয়ে। এসব গাছে জৈব সার ব্যবহার করা হয়। নিয়মিত দেয়া হয় পানি। বাগানের চারপাশ লোহার নেট দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে বিনিয়োগ করা হয়েছে সাত লাখ টাকা।

রসায়নে মাস্টার্স পাস আহাদ আলী বলেন,'আমার স্ত্রী নতুন নতুন স্বপ্ন দেখা মানুষ। সে মাটিতে যে চুঁইঝাল চাষ করা যায় সেটি কৃষি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে শোনে। এরপর থেকে চেষ্টা শুরু

করে মাটিতে চুঁইঝাল চাষের। যেই চিন্তা সেই কাজ। আমার বাগানে তৈরি চারা দিয়ে চাষ শুরু করে। এরপর এগিয়ে আসে সদর উপজেলা কৃষি অফিস। তারা কিছু হাইব্রিড চারা দেয়। যদিও সেই চারা অনেক দুর্বল থাকায় বেশিরভাগ মারা যায়। আমার নিজের তৈরি চারাই বেঁচে আছে। এটি সফল হলে যশোরের কৃষিতে নতুন একটি অধ্যায় শুরু হবে। কারণ চুঁইঝাল চাষ করতে হলে ব্যাপক সংখ্যক গাছ থাকতে হয়। এ কারণে চাষ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। অপরদিকে, মাটিতে চাষ অনেকের জন্য সহজ হবে। অল্প জায়গায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে এই চাষ সম্ভব এবং লাভজনক হবে।' কেবল চুঁইঝাল চাষ না, এর চারা উৎপাদন করে এই দম্পতি বছরে পাঁচ লাখ টাকা আয়ের টার্গেট নিয়েছে।

## ঝরা পাপড়ির প্রসাধনী

ফুলের পাপড়ি দিয়ে নানা ধরনের পণ্য তৈরির সূচনা করেছেন যশোরের নারীরা। অবিক্রিত এবং ঝরেপড়া ফুলের পাপড়ি দিয়ে ১৫ জন নারী নিয়মিত রঙ, সাবান, কাপড়ের কালার, তেল, আগরবাতি, গোলাপজল ও পার্লারে ব্যবহৃত পাউডার তৈরি করছেন। এর বাইরে শুকনো পাপড়ি দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের ওয়ালমেট। 'ফুলের কথা ফাউন্ডেশন' নামে একটি সংগঠনের সদস্য তারা। এই প্রতিষ্ঠানে আরও ৫০ জনের মতো সদস্য রয়েছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাসরিন নাহার নামে এক নারী।

২০২৩ সালে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের ওয়াই এস আর হর্টিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে এ বিষয়ে মাত্র ১০ দিনের প্রশিক্ষণ নেন নাহার। দেশে ফিরে কিছু নারী কৃষক নিয়ে কাজ শুরু করেন। জানান, গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরি পাউডার অনেক দামি। পার্লারগুলোতে এই পাউডারের অনেক চাহিদা রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে বড় পরিসরে বাজারজাত করবেন তারা। তবে, পুঁজি স্বল্পতায় অনেক কাজ ঠিকমতো করতে পারছেন না।

কৃষিতে নতুন নতুন উৎপাদনে পথ দেখানো নারীরা সকলেই অর্থনৈতিক সংকটে আছেন। তাদের বক্তব্য,সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দেন বাহবা। তোলেন সেলফিও। এর বাইরে আর কোনো সহযোগিতা মেলেনা। অথচ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বড় কিছু করার সক্ষমতা রাখেন এসব নারী।

**ভার্মি ও ট্রাইকো কম্পোস্ট:** নতুন একটি জৈব সার উৎপাদন শুরু করেছেন যশোরের নারীরা। সারটির নাম ট্রাইকো কম্পোস্ট। যশোর সদর উপজেলার নাটুয়াপাড়া গ্রামের স্মৃতি রাণী বিশ্বাস এই সার প্রথম উৎপাদন শুরু করেন। ২০২০ সালে ট্রাইকো কম্পোস্ট শুরু করেন তিনি। এখনও অব্যাহত রেখেছেন।

স্মৃতি রাণী বিশ্বাস জানিয়েছেন, ট্রাইকো কম্পোস্ট সার তৈরি করতে কচুরিপানা, মুরগির বিষ্ঠা, গোবর, কাঠের গুঁড়া, চিটা গুড়, নিমের পাতা, সবজির উচ্ছিষ্ট ও ট্রাইকো ডার্মা পাউডার প্রয়োজন। এসব উপকরণ একসাথে মিশিয়ে হাউজে ফেলতে হয়। দু' থেকে তিনমাস রাখতে হয় সেখানে। তারপর খুব ভালোভাবে মিশিয়ে করা হয় ব্যবহার উপযোগী। প্যাকেটজাত ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রতি কেজি ২০ এবং খোলা প্রতি কেজি ১২ থেকে ১৫ টাকায় বিক্রি করেন স্মৃতি রাণী।

ট্রাইকো কম্পোস্টের বিশেষত্ব কী জানতে চাইলে স্মৃতি রাণী বলেন,'ভার্মি কম্পোস্টের সাথে এই সারের বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ভার্মি কম্পোস্ট কেবল ফসলের খাবার জোগায়। আর ট্রাইকো কম্পোস্ট খাবার জোগানোর পাশাপাশি কীটনাশকের কাজও করে। ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করলে কৃষককে বাড়তি কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।'

স্মৃতি রাণী জানান, ট্রাইকো কম্পোস্ট সার বেশিরভাগ কৃষক চেনে না। নাম জানে খুব কম মানুষ। এ কারণে এর ব্যবহারও কম। তিনি ট্রাইকো কম্পোস্ট সারের গুণাগুণ নিয়ে প্রচারণার দরকার বলে মনে করেন। এর আগে ২০১৭ সালে ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি করেন তিনি। ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি করে কৃষি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন স্মৃতি রাণী।

সদর উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্যমতে, এখনও পর্যন্ত এই উপজেলায় ২৯ জন নারী ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন করছেন। তাদের দেখাদেখি অনেক জায়গায় পুরুষরাও এগিয়ে এসেছেন এ কাজে।

দেয়াড়া ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামের মহিলা মেম্বার রোকেয়া বেগম বলেন,'আমি ২৫ বছর আগে নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন শুরু করি। এখনও চালু রয়েছে। সেইসাথে উৎপাদন করি বায়োগ্যাস। দু'টো গরুর গোবর দিয়ে এই প্রজেক্ট শুরু করি। সাত ফুট বাই সাত ফুট হাউজের জন্য দু'টো গরুর গোবর যথেষ্ট। ৩০০ টাকা মণ দরে চাষিরা আমার বাড়ি থেকে গোবরের তৈরি ভার্মি কম্পোস্ট নিয়ে যায়।'

যশোরে বৈচিত্রময় আয়ে নারী

পর্ব: ০২

# মাশরুম চাষে পাল্টে গেছে শতাধিক নারীর জীবন

- ১৫৩ জন চাষির মধ্যে ১১৩ জন নারী
- ১১৩ নারীর মধ্যে ১০৩ জনই সফল
- যশোরে উৎপাদন ১ হাজার ৩৬ টন
- ৩০০ পরিবার চলে মাশরুমের উপর ভর করে

কারো আছে বেদনাদায়ক অতীত, কারো দু'বেলা দু'মুঠো ভাত না জোটার গল্প অথবা কারো আছে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার সংগ্রামের গল্প। জীবন ও জীবিকার চ্যালেঞ্জে এখন ওরা জয়ী। অনেক গৃহবধূ, বিধবা এমনকি অভাবে দিশেহারা বৃদ্ধাও এখন একজন করে আর্থিক স্বাবলম্বী নারী। কেউ কেউ আবার পরিণত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানে। আর পথ দেখাচ্ছেন যশোরাঞ্চলের আরও অনেক নারীকে। বলছি মাশরুম চাষ করে জীবন পাল্টে যাওয়া যশোরাঞ্চলের ১০৩ নারীর গল্প।

যশোরে মাশরুম চাষ ও বাজারজাতে সংখ্যায় এবং সাফল্যে পুরুষের তুলনায় নারীরাই এগিয়ে। নতুন চমক দেখিয়েছেন চপ, বড়া, ফ্রাই, আচার স্যুপ, কেক, জেলি, চা কফিসহ জনপ্রিয় অনেক খাবার তৈরি করেও। হয়েছেন মডেল, পেয়েছেন জয়ীতা খেতাবও। হর্টিকালচার সেন্টার ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোরের তথ্যানুযায়ী, জেলার ১৫৩ জন মাশরুম চাষির মধ্যে ১১৩ জনই নারী। আর এই ১১৩ নারী মাশরুম চাষির তালিকা থেকে দৈব চয়ন ভিত্তিতে ২০ জনের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে সফলতার তালিকায় উঠে এসেছেন ১০৩ জন। এদের সবার রয়েছে আলাদা আলাদা গল্প। মাথায় সব সময় খেলে চলে কাঠের ভূসি, গমের ভূসি, ধানের তুষ ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে মন্ড তৈরির চিন্তা। টিস্যু কালচার, মাস্টার মাদার কালচার, মাদার কালচার, স্পন (মাশরুম উৎপাদনের ছোট পাত্র) প্যাকেট আর পুষ্টি উপাদান প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণের কথা। আর্থিক সফলতার কারণে কেউ সংসারের হাল ধরেছেন। কেউ স্বামীর সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখছেন। আবার কেউ গোটা সংসার চালিয়েও কুড়ে ঘর থেকে ইটের ঘরের মালিক। কারো হয়েছে জমি, ব্যাংকে জমেছে টাকা।

আর ওই ১০৩ জনের হাত ধরে কমবেশি প্রশিক্ষিত হয়ে আরও ২০০ নারীও ছোট্ট পরিসরে এই মাশরুম চাষে যোগ দিয়েছেন। নতুন স্বপ্ন দেখছেন। প্রতি বছর দেশে উৎপাদিত ৪০ হাজার মেট্রিকটন মাশরুমের মধ্যে যশোরের ওই ১০৩ জন ও ছোট্ট পরিসরে উৎপাদন করা ২০০ জন মিলিয়ে ৩০৩ জন নারী উৎপাদন করছেন এক হাজার ৩৬ মেট্রিকটন মাশরুম। উৎপাদিত ওই মাশরুম যশোরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুড ও বিভিন্ন মোড়ে গড়ে ওঠা ভাজাভুজির দোকান মিলিয়ে ১০৭ টি প্রতিষ্ঠানে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি পুষ্টিগুণের কারণে যশোরের বাজার ছাড়াও বাইরে পাঠানো হচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মাশরুম কেন্দ্রিক জীবন জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে ওই ৩০৩ জন নারী ও তাদের পরিবারের। সংশ্লিষ্ট অনেক নারী চাষির দাবি,অল্প পুঁজি লাগলেও অনেকেরই তা নেই, তাই তাদের দাবি ঋণ সুবিধার।

বিগত নয় বছরে হর্টিকালচার সেন্টার ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দিয়েছে অনেক নারীকে। ট্রেনিংপ্রাপ্তরা আবার হাতেকলমে শিখিয়েছেন আরও নারীকে। কোনো প্রশিক্ষণ না নিয়েও যশোরের অনেক নারী ভালো মাশরুম চাষ করছেন। তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সফলতার দৃষ্টান্ত দেখে নারী মাশরুম চাষির সংখ্যা বাড়ছে যশোরে। দৈনিক আধা কেজি, আড়াইশ' গ্রাম উৎপাদন করে অনেক নারী কাছের ভাজাভুজির দোকানে বিক্রি করেন,সংসারের খরচ যোগান।

এই চাষে সফল এক নারীর নাম আশরাফোন খাতুন আশা। সদর উজেলার জঙ্গলবাঁধাল খালপাড়ার স্বামী হারা কন্যা সন্তানের জননী আশরাফোন খাতুন আশা এক সময় অভাবের কারণে দু'বেলা ভাত খেতে পারতেন না। এখন মাসে আয় করেন প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

শুধু মাশরুম চাষ করেই যশোরের নারীরা এগিয়ে যেতে পারেন,এমন বিশ্বাস অনেকের। যশোরে পুরুষের চেয়ে মাশরুম চাষে মেয়েরা এগিয়ে। অল্প বয়সী মেয়ে থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধাও করেন মাশরুম চাষ।

## সরকার গুরুত্ব দিলে যশোরে মাশরুম চাষে আরও গতি আসবে

কথা হয় মাশরুম চাষি পুরাতন কসবা ঘোষপাড়ার মোমেনা আক্তার, ঝিকরগাছার ছবেরা খাতুন ও চাঁচড়ার পবিত্রার সাথে। এক সময় কঠিন পরিস্থিতি পার করেছেন তারা। লোকমুখে মাশরুম চাষে অল্প পুঁজিতে সহজে সাফল্যের কথা শুনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তাদের সংসার চলে এখন মাশরুম চাষের ওপর নির্ভর করে। যশোরসহ সারা দেশের শহরে মাশরুম বিক্রির ভালো বাজার রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে বেশি নারীকে সম্পৃক্ত করা গেলে মাশরুম চাষকে যশোরে বিস্তৃত করা সম্ভব বলে মনে করেন মোমেনা।

## যশোরে ৫০টি মাশরুম চপের দোকান

যশোরের আইনজীবী সমিতি মোড়ে বিরামপুর ফকিরার মোড়ের সালাউদ্দিন প্রতিদিন পাঁচ কেজি ও পুলেরহাটের মন্ডলগাতির বাবুল প্রতিদিন ১০ কেজি মাশরুমের চপ বিক্রি করেন। মণিহার সিনেমাহলের সামনের জামাল উদ্দিন, মাইকপট্টির শামীম আহমেদ, কোতোয়ালি থানা মোড়ের জুনায়েত ফাস্ট ফুড, আরবপুরের মনির ফাস্ট ফুড, রফিকুল স্টোরসহ জেলায় ৫০টি স্পটে চলছে মাশরুমের তৈরি খাবার। এছাড়া, যশোরের অভিজাত রেস্তোরাঁ আড্ডাখানায় মাশরুমের স্যুপ চা কফি বিক্রি করা হয়। এসব দোকানে প্রতিদিন প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কেজির মতো মাশরুম চলে। আর এসব মাশরুমের বেশিরভাগ আসে নারী চাষিদের কাছ থেকে। দোকানি সালাউদ্দিন ও বাবুল জানিয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের মাশরুম ও মাশরুমের তৈরি ফাস্টফুড যশোরে বেশ ভালো চলে। চাহিদার তুলনায় মাশরুমের উৎপাদন কম। শুধু মাশরুমের চপ বিক্রি করেই ৪০ টির উপর পরিবার চলছে। উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

## ট্রেনিং ছাড়াও দু'শতাধিক নারী এই চাষে

হর্টিকালচার সেন্টারের শ্রমিক ইব্রাহিম রানা জানিয়েছেন, জেলায় কমবেশি মাঠ পর্যায়ে তার খোঁজখবর রয়েছে। মাশরুম ইনস্টিটিউট ও হর্টিকালচার সেন্টারের ট্রেনিং পাওয়া নারী ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও দু'শতাধিক নারী। গরমের মৌসুমে উৎপাদন কম হয়, শীতে বেশি।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্বল্প পরিসরে যারা উৎপাদন করছেন তাদের স্থানীয় বাজার তিনি তৈরি করেছেন। ইব্রাহিম রানা জানান, যারা এখন প্রতিদিন আড়াইশ' গ্রাম, দুশ' গ্রাম, আধা কেজি উৎপাদন করছেন সেগুলো এক জায়গায় করে অফিস টাইমের পরে তিনি বাজারজাত করেন। আড়াইশ' টাকা করে প্রতি কেজির দাম দেন। আর তিনি ৩০০ টাকা করে বিক্রি করেন। হর্টিকালচার সেন্টার ও কৃষি অফিসে ট্রেনিং তালিকার হিসেবের বাইরে যে দুশ'র মতো নারী চাষি রয়েছেন তারা সংসারে কিছুটা হলেও সহায়তা দিতে পারছেন মাশরুম চাষ করে।

## ব্যাংক ঋণ সুবিধা

অনেকে পুঁজির অভাবে ব্যবসা বিস্তার কিংবা শুরু করতে পারছেন না। তারা ব্যাংকে আবেদন করতে পারেন ঋণের জন্য। স্বল্পসুদে কৃষি ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে সহজেই মাশরুম চাষি ও উদ্যাক্তারা আবেদন করতে পারেন বলে ব্যাংক কর্মকর্তাদের দাবি।

এ ব্যাপারে কর্মসংস্থান ব্যাংক যশোর শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সেলিম রেজা গ্রামের কাগজকে জানিয়েছেন, মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তরা ঋণ সুবিধার আওতায় আসতে পারেন। মাশরুম লাভজনক ফসল বলা চলে। কাজেই যারা উৎপাদনে আছেন বা এই চাষে নিযুক্ত হতে চান তারা আবেদন করতে পারেন।

হর্টিকালচার সেন্টার যশোরের উপপরিচালক কৃষিবিদ দীপঙ্কর দাশ জানিয়েছেন, নারীর কর্মসংস্থানে মাশরুম চাষ অত্যন্ত উপযোগী। বাড়ির বারান্দা বা বসত ঘরের পাশের অব্যবহৃত জায়গায় অনেক পরিমাণ মাশরুম চাষ করা যেতে পারে। তিনি যশোরের নারী মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের পিওর কালচার এবং মাস্টার মাদার কালচার (টিস্যু কালচারের মাধ্যমে করা) সরবরাহ করে বীজ উৎপাদনে সহায়তা করছেন। টিস্যু কালচার, মাস্টার মাদার কালচার, মাদার কালচার, স্পন প্যাকেট এবং বিভিন্ন প্রকার মাশরুম বিক্রির বাজার তৈরিতেও সহায়তা করছেন তারা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোরের সদ্য সাবেক উপপরিচালক ডক্টর সুশান্ত কুমার তরফদার জানিয়েছেন, যশোরে মাশরুমের চাষ নারীদের বেকারত্ব কমাচ্ছে। তারা মাশরুমের বাজার তৈরি ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান আলী জানিয়েছেন, যশোরের মাশরুম চাষ ইতিমধ্যে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সাড়া ফেলেছে। বেশিরভাগ কৃষক হচ্ছে ক্ষুদ্র প্রান্তিক এবং ভূমিহীন। ছোট উদ্যোগের পাশাপাশি অনেকে বড় বড় মাশরুম ফার্মও গড়ে তুলেছেন। জেলায় বছরে এক হাজার ৩৬ মেট্রিক টন মাশরুম উৎপাদিত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

পর্ব: ০৩

# তারা এখন দেশে-বিদেশে আলোচিত

যশোরে এমন একজন কিংবদন্তি প্রবীণ নারী উদ্যোক্তা আছেন যাকে ঘিরে বিশ্বের বহু মানুষ যশোরকে চেনে। তার কারণে পরের সকল প্রজন্মেই নারীদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা একটু একটু করে বেড়েছে। তদূপরি, আধুনিক নানা সুযোগ-সুবধিার প্রাপ্তি সহজ হওয়ার সাথে সাথে যশোরে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত। গত দশ বছরে যশোরে নারী উদ্যোক্তা পাঁচগুণেরও বেশি বেড়েছে, এমন চিত্র পাওয়া যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায়, যুব উন্নয়নসহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান থেকে।

সরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের হিসেব অনুসারে যশোরে ৫০০ নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন। তাদের কেউ কেউ নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এরপর ধীরে ধীরে হয়েছেন নারী উদ্যোক্তার দৃষ্টান্ত। তাদেরকে কেন্দ্র করে অন্যরাও উদ্যোক্তা হওয়ার চেষ্টা করছেন।

এ কারণে যশোরে নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে বলে অনেকের ধারণা। ত্রিশ বছর বয়সী সালমা ইসলাম বলেন,'১০-১৫ বছর আগেও কেক কিনতে হতো বেকারিতে গিয়ে এখন বাড়ি বসে পাই। এটি সম্ভব হচ্ছে নারীদের কারণে। অনেক নারী এখন বাসায় ভালো কেক তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করছেন। এভাবে বহু জিনিস নারীরা নীরবে সরবরাহ করছেন সমাজে'।
সাফায়াত হোসেন কলেজ শিক্ষক। তিনি বলেন,'যশোরে নারী উদ্যোক্তার বিকাশ দ্রুত হচ্ছে। এক যুগ আগেও ভাবা যেতো না, এমন কাজ এখন নারীরা করেন স্ব-উদ্যোগে। যা অত্যন্ত ইতিবাচক।'

কাশফিয়া, লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়িতে বসে কেক তৈরি করে অনলাইনে মার্কেটিং করছেন। সাড়াও পাচ্ছেন বেশ। এটি করে পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু আয়ও করছেন তিনি।

সুলতানা রিনি, বয়স ২৯। নয় বছর ধরে চালাচ্ছেন বিউটি পার্লার। তার কাছে কাজ শিখে রিতা নামে আরেক নারী নিজে এখন বিউটি পার্লারের মালিক।

## যশোরের পাঁচ নারী উদ্যোক্তা, যারা অন্যদের অনুপ্রেরণা

অ্যাঞ্জেলা গোমেজ। জন্ম ১৬ জুলাই ১৯৫২। সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে রেমন ম্যাগসেসাই পুরস্কার পান। অ্যাঞ্জেলা গোমেজ যশোরের বাঁচতে শেখা'র প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠান গ্রামের নারীদের হস্তশিল্প, কৃষি, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মৌমাছি পালনসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে। এ পর্যন্ত ৪০০ গ্রামের ২০ হাজার নারীকে সাহায্য করেছে। এ কারণে ২০০০ সালে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন অ্যাঞ্জেলা গোমেজ।

১৯৮১ সালে 'বাঁচতে শেখা'র যাত্রা শুরু। হস্তশিল্পের কাজের মান উন্নয়নের জন্য সদর উপজেলার কাশিমপুর, পাগলাদহ, নূরপুর ও খোলাডাঙায় ঘর নির্মাণ করেছে। গ্রামের বহু শত নারীকে কাজে সম্পৃক্ত করে বাঁচতে শেখা। নারীর নানান স্বার্থে কর্মসূচি নেয়। গ্রামের পরিত্যক্ত পুকুরে মাছ চাষ, কৃষি কাজ করে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটান অ্যাঞ্জেলা। একপর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প খোলেন। ১৯৮৬ সালে শহরের আরবপুর এলাকায় স্বল্পমূল্যে ১৭ বিঘা জমিসহ একটি পরিত্যক্ত ভবন কিস্তিতে কেনেন অ্যাঞ্জেলা গোমেজ। জঙ্গল কেটে কৃষি কাজ শুরু করেন তার কর্মীরা। পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার করে মাছ ছাড়েন। হস্তশিল্পের কাজ, আচার তৈরি,

হাঁস-মুরগি গরু-ছাগলের খামার তৈরি করে আরবপুরের জমিটিকে একটি সমন্বিত কৃষি খামারে পরিণত করেন। অ্যাঞ্জেলা গোমেজ এখন ১০ লাখ উপকারভোগীর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

বাঁচতে শেখা বর্তমানে শিক্ষা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মানবাধিকার উন্নয়ন, নারীদের ভোট শিক্ষা, হস্তশিল্প, কৃষি, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৌ চাষ, রেশম চাষ, মৎস্য চাষ, ঘূর্ণায়মান ঋণ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনী প্রকল্পে কাজ করছে। অবদানের জন্য দেশি বিদেশি নানা পুরস্কার ও সম্মাননা পান তিনি।

যশোরের আরেক সফল নারী উদ্যোক্তা অর্চনা বিশ্বাস। জয়তী সোসাইটির পরিচালক তিনি। তার পুরো জীবনই সংগ্রামের। তাকে দেখে অনেক নারী উজ্জীবিত হন, হয়েছেন। সংগ্রামী অর্চনা বিশ্বাস যশোরে কর্মমুখী নারীদের প্রতিচ্ছবি।

নড়াইলের নলদীর চর গ্রামে জন্ম নেয়া অর্চনা ছোট বেলা থেকেই গ্রামীণ নারী ও গরিব মানুষের শ্রেণিবৈষম্য, নির্যাতন, অসমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তার লেখাপড়া বন্ধ হয় স্কুল জীবনেই।

তিনি স্কুলে এবং গ্রামে ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে মেয়েদের সংঘবদ্ধ করেন। তৎকালীন সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়ায় রোষানলে পড়েন অর্চনা বিশ্বাস। হুলিয়া হয় তার বিরুদ্ধে। এ কারণে আত্মগোপনে থেকেও কাজ চালান। কাজের সূত্রে পরিচয় হওয়া মুসলিম ছেলেকে ১৯৭৬ সালে বিয়ে করেন। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন স্বামী নাজিম উদ্দিন ও অর্চনা। সামাজিক অনেক বাধা পেরিয়ে যশোর শহরে বসবাস শুরু করেন তারা। কোনোরকম আর্থিক সহযোগিতা পাননি শ্বশুর ও বাবার বাড়ি থেকে। রাজনৈতিক কারণে স্বামী নাজিম উদ্দিন জেলে থাকায় সংসারে নেমেছিল চরম সংকট। যশোর শহরের বস্তির একটি ছোট্ট ঘরে ছেলেকে নিয়ে অর্চনা শুরু করেছিলেন জীবন সংগ্রাম।

এরই মধ্যে পরিচয় হয় জাগরণী চক্রের নির্বাহী পরিচালক আজাদুল কবির আরজুর সাথে। তিনি বস্তিতে ৩০০ টাকা বেতনে শিক্ষা সেবিকার কাজ করার প্রস্তাব দেন অর্চনাকে। বস্তিতে কাজ করার সময় তিনি দেখতে পান সমাজের মানুষের দুর্দশার চিত্র। অর্চনা মনে করেন নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হলেই তাদের ওপর নির্যাতন, অবহেলা, অসম্মান কমে যাবে।

এসব বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের পাঠ বঞ্চিত অর্চনা ফের পড়ালেখা শুরু করেন। একপর্যায়ে ১৯৮৩ সালে এসএসসি, ১৯৮৫ সালে এইচএসসি, ১৯৮৭ সালে বিএ এবং ১৯৯০ সালে এমএসএস পাস করেন। ১৯৭৯ সালে বস্তিতে শিক্ষা সেবিকা হিসেবে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে শিশু শিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক, শিক্ষা সমন্বয়কারী, কর্মসূচি সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষণ

সমন্বয়কারী এবং প্রকল্প পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান।

'নিজেরাই করবো নিজেদের উন্নয়ন' স্বপ্নকে সামনে নিয়ে অর্চনা ২০০২ সালে জয়তী সোসাইটির যাত্রা শুরু করেন, যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮ হাজার এবং তাদের সবাই নারী। এসব নারীর অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে জয়তীতেই।

জয়তী সোসাইটির মোট কর্মীর ৯৮ শতাংশ নারী। অর্চনা বিশ্বাস জানান, জয়তীর বিভিন্ন ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে কর্মীদের বেতন-ভাতা দেন। যশোর শহরে নিজস্ব জমিতে গড়েছেন জয়তী ভবন। সেখানে আছে সমাজের প্রয়োজনে নানা আয়োজন। জয়তী সোসাইটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ঢেঁকিছাটা চাল, ভেজালমুক্ত আচার ও গুঁড়ো মশলা তৈরি করে বিক্রি করছে। আছে কালোজিরা, নারিকেল, তিল, সরিষা ও বাদামের তেল। মৌসুম অনুযায়ী, ফুল, গুড়, আম, সবজিসহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে থাকে।' অর্চনা বিশ্বাস পেয়েছেন বেগম রোকেয়া পদক। দেশি-বিদেশি আরও সম্মাননায় ভূষিত অর্চনা।

আরেক নারী উদ্যোক্তা অনুপমা মিত্র। যশোরের ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথাকে দেশ-বিদেশে পরিচিত করেছেন। তিন বছর বয়সে তিনি পোলিও আক্রান্ত হলে তার একটি পা অচল হয়ে যায়। তারপরও বুদ্ধি ও পরিশ্রমে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন তিনি। ২০০৫ সালে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার পান। সর্বশেষ, তিনি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' পেয়েছেন। শহরের নীলগঞ্জে তার বাড়িতেই কারখানা তৈরি করেছেন। আর যশোর শহরের মুজিব সড়কে শোরুম করেছেন তিনি।

বরিশাল থেকে যশোর শহরে আসে অনুপমার পরিবার। লেখাপড়া পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই কিছু করার চিন্তা করেন এই নারী। তখন বড় ভাই রঞ্জিত কুমার মিত্র তাকে নিয়ে যান বাঁচতে শেখায়। সেখান থেকে নকশিকাঁথা সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ নেন তিনি। এরপর শহরের নীলগঞ্জের বাড়িতে তিনি নকশিকাঁথার কাজ শুরু করেন। সেই নকশিকাঁথা তিনি বিক্রি করতেন বিভিন্ন স্থানে। এরপর অনুপমা যশোর শহরের মুজিব সড়কে 'আয়োজন' নামের একটি শোরুম প্রতিষ্ঠা করেন। একইসাথে তিনি সমাজের অসহায় দরিদ্র নারীদের কথা ভাবতে শুরু করেন। এরপর তিনি তার আশপাশের অসহায়, দরিদ্র, দুস্থ, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জোগাড় করে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করেন। তাদের নকশিকাঁথা সেলাইয়ের কাজে প্রশিক্ষণ দেন। বর্তমানে তার দিকনির্দেশনায় ৬৫০ জন নারী হাতের কাজ করেন। এদের মধ্যে ১০০ মহিলা উদ্যোক্তা হয়েছেন। তারাই সব কাজ দেখাশোনা করেন। যশোর ছাড়াও তার তৈরি নকশিকাঁথা এখন ঢাকাসহ সারাদেশে যাচ্ছে। যশোরে যেসব প্রতিষ্ঠান নকশিকাঁথা তৈরি করে, তাদের মধ্যে অনুপমা মিত্রের প্রতিষ্ঠান শীর্ষে রয়েছে।

যশোরে সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত সুফিয়া মাহমুদ রেখা। ১৯৯২ সাল থেকে কাজ শুরু করেন। বুটিক দিয়ে শুরু, এরপর ১৯৯৪ সালে সানন্দা বিউটি পার্লার ও সানন্দা বুটিকস নাম দিয়ে দু'টি প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন। একইসাথে উদ্যোক্তা তৈরির কাজও করেন। তিনি এখন একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। পেয়েছেন জয়িতা পুরস্কারও। তার প্রতিষ্ঠানে ১২ জন নারী কাজ করছেন। বর্তমানে যশোরে ৭২ জন বিউটি পার্লার উদ্যোক্তা রয়েছেন। সুফিয়া মাহমুদ রেখা জেলা উইমেন্স বিউটি পার্লার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সফল উদ্যোক্তাদের মধ্যে তনুজা রহমান মায়া, সুমি শেখ, শ্রাবনী আক্তার, মির্জা মাসুমা আর সুমি, উম্মে কলুসুম হিরা আফরোজা আক্তার তিথি অন্যতম।

আরেকজন সফল নারী উদ্যোক্তা যশোরের বিরামপুর কালীতলার নাজমুন নাহার শিরিন।

প্রথমে শখের বশে থেকে ২০০৬ সালে সামাজিক কাজে নামেন তিনি। সাজ বিউটি পার্লারের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর অ্যাচিভ শিশু ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গঠন করে ২০১৫ সাল থেকে উদ্যোক্তা তৈরির কাজ শুরু করেন এই নারী। বর্তমানে তিনি যুব উন্নয়নের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতি মাসে দু'ব্যাচে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উদ্যোক্তা হয়েছেন, শাহাজাদী ইসলাম, ঋতুপর্ণা, মুনমুন রহমান ও দিনা খাতুন। তার প্রতিষ্ঠান থেকে নকশিকাঁথা-থ্রিপিসে কারুকাজ শিখে ও বনায়ন করেও স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেকে।

২০২২ সালে জয়িতা পুরস্কার পাওয়া আরেকজন নারী উদ্যোক্তা খাদিজা খানম। ২০০০ সালে ঘরোয়াভাবে কাজ শুরু করেন তিনি। ২০১০ সালে উদ্যোক্তা হিসেবে বুটিক হস্তশিল্প নিয়ে কাজ শুরু করেন খাদিজা। এখন তার তৈরি পণ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি ১৪ জন টিম লিডার ও সাতজন কর্মী নিয়োগ দিয়ে প্রতি মাসে ৭০০ থ্রিপিসে হাতের কাজ করান। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তার হাতের কাজের তৈরি পোশাকের বাজার তৈরি হয়। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও ৩৫ জন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তার প্রতিষ্ঠা করা মহুয়া সমাজ কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দু'হাজারের বেশি নারীকে তিনি সম্পৃক্ত করেছেন এই বুটিক শিল্পে। খাদিজা খানমের মাধ্যমে বর্তমানে সফল নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে শংকরপুরের লিপি বেগম, পুলেহাটের লাকী পারভীন অন্যতম। একসময় অসচ্ছল থাকলেও বর্তমানে অনেকেই বাড়ি গাড়ির মালিক।

পর্ব: ০৪

# ই-কমার্সে যশোরে ৫১ নারীর সফলতা

বড় মার্কেটে তাদের নেই কোনো দোকান। নামমাত্র বিনিয়োগ। একটি থেকে দু'টি স্মার্ট মোবাইল ফোন। আবার কেউ কেউ নিজের বসতবাড়ির একটি ঘর কিংবা শুধু রান্না ঘরকে পুঁজি করেই এখন জীবিকা নির্বাহ করছেন। যশোর জেলার ৫১৩ নারী উদ্যোক্তার মধ্যে ৫১ জনই ই-কমার্সে সাফল্য অর্জন করেছেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যশোর জেলা কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যশোরে নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের তথ্যানুযায়ী, জেলার ৫১৩ জন নারী উদ্যোক্তার মধ্যে ১৫০ জনের অনলাইন ব্যবসার ফেসবুক পেইজ রয়েছে। ২০ জন অনলাইন ভিত্তিক নারী উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

- ৫১৩ নারী উদ্যোক্তার ১৫০ জনের পেইজ আছে
- ২০ জন নারী শুনিয়েছেন ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত এসব নারী ১০ বছর আগেও সংসারে অভাব অনটনের কারণে নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন। বর্তমানে ফেসবুকে পেইজ খুলে মাসে কয়েক লাখ টাকার পণ্য কেনাবেচা করছেন। মাসে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা উপার্জন, আবার কোনো উৎসবের সময় মাসে ৫০ হাজার টাকা থেকে লাখ টাকার উপরে আয় করছেন অনলাইনে ব্যবসা করে। ইতিমধ্যে সম্ভাবনাময় ই-কমার্স সেক্টরের ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেয়ার পর্যায়ে চলে গেছেন তিনজন নারী। কেউ শাড়ি-থ্রিপিস, কেউ হাতের কাজের তৈরি পোশাক, কেউ নানা স্বাদের রকমারি খাদ্য, বিশেষ দিনের গিফট আইটেম, কেউ প্রসাধনীসহ, নানা পণ্যের জন্য ফেসবুকে পেইজ খুলে ব্যবসা করছেন। উঠে এসেছে ফেসবুক পেইজকে পুঁজি করে ফুল, গুড়, আম, ঢেঁকিছাঁটা চাল, ভেজালমুক্ত আচার বিক্রির গল্প। পাওয়া গেছে সাফল্যের আরও নানা চিত্র। সফল নারীরা জানিয়েছেন, চাকরির পেছনে না ছুটে স্বল্প পুঁজিতে স্বাবলম্বী হওয়ার বড় মাধ্যম এখন ই-কমার্স।

বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে জেলায় নিবন্ধনপ্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন ৩০৮ জন। এদের মধ্যে ৮০ জনের রয়েছে নিজস্ব ফেসবুক পেইজ। আবার যশোর নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের তথ্যানুয়ায়ী, ১০৫ জন তাদের নিজের নামের ফেসবুক পেইজে ই-কমার্সের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে বেশিরভাগই উপার্জনে রয়েছেন। যুবউন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া নারীদের মধ্যে ১৩ জন ই-কমার্স ব্যবসায় জড়িত। সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নেয়া ১৭৯ জন সমবায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের নামে সামাজিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাদের মধ্যে ২১ টি প্রতিষ্ঠান নারী প্রধান। এদের সাতজন চালাচ্ছেন ফেসবুক পেজ ভিত্তিক ই-কমার্স ব্যবসা।

আবার যশোর জেলা উইমেন্স বিউটি পার্লার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যানুযায়ী, তাদের ৭২ জন উদ্যোক্তা রয়েছেন। এদের মধ্যে ১৫ জনের রয়েছে ফেসবুক পেজ। আবার অনেক নারী উদ্যোক্তা একই সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত। কেউ সমাজসেবা, কেউ সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে হয়েছেন অনুকরণীয় নারী উদ্যোক্তা। দৈনিক গ্রামের কাগজের পক্ষে ১৫০

জনের মধ্যে ২০ জন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়।

যশোর জেলা উইমেন্স বিউটি পার্লার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নারী উদ্যোক্তা সুফিয়া মাহমুদ রেখা জানিয়েছেন, জেলায় বিউটি পার্লার ভিত্তিক ৭২ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১২ জনের ফেসবুক পেইজ রয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জনই ভালো করছেন। তারা হচ্ছেন, তাহা পারভীন, রেক্সোনা পারভীন ডলি, তনুজা রহমান মায়া, সুমি শেখ, শ্রাবনী আক্তার, মির্জা মাসুমা আর সুমি। এদের মধ্যে কেউ কেউ নকশিকাঁথা, নকশি বেডশিট, থ্রিপিস, ওয়ান পিস, টু পিস, কুশন কভার, হাতের কাজের ব্যাগের সমাহার নিয়ে ই-কমার্স করেন। ২০১৮ সাল থেকে তারা ব্যবসায় যুক্ত হন ফেসবুক পেইজে। সানন্দা বিউটি পার্লার ও সানন্দা বুটিকস দু'টি ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে ব্যবসা করে আসছে। ই-কমার্সে তারা ভালো করছে।

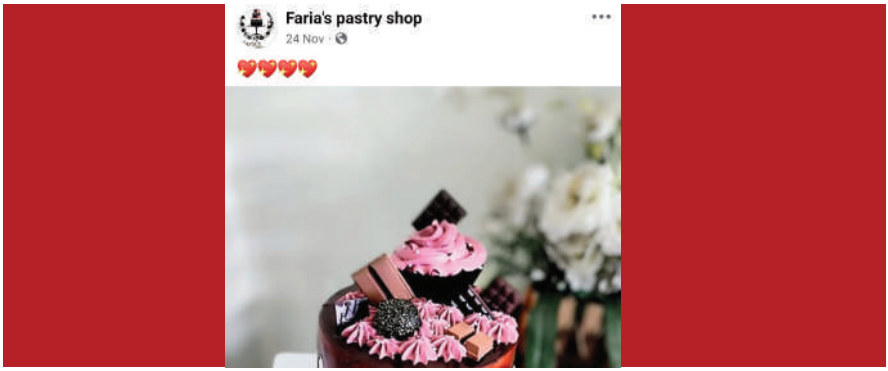


## অনামিকা'স কিচেনে অর্ডার বাড়ছে যশোরের খেজুর গুড়ের

অনামিকা সাহা, রেলরোড ষষ্টিতলাপাড়ার গৃহবধূ। গ্র্যাজুয়েট নারী। স্বামীর সংসারে আর্থিক সহায়তা দেয়ার অদম্য ইচ্ছা তাকে তাড়া করতো। এরপর ২০১৮ সালে তিনি মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে উদ্বুদ্ধ হন। অর্ধযুগ পর এখন ই-কমার্স কেন্দ্রিক তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। দৈনিক গ্রামের কাগজকে তিনি জানান, স্বামী সন্তান নিয়ে সফলতার সাথে দিনাতিপাত করছেন। এখন প্রতিদিনই অনলাইনে তার পেইজ থেকে যশোরের খেজুর গুড়ের অর্ডার বাড়ছে, ভোক্তা বাড়ছে। ভালো খাদ্যপণ্য প্রসাধনী পাঠিয়ে তার পেইজ এখন বেশ জনপ্রিয়। প্রতি মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছেন অনামিকা। ঈদ-পূজাসহ বিভিন্ন উৎসবে আয় দাঁড়ায় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। নানা প্রতিকূলতার কারণে চাকরি করতে পারেননি। ভালো রান্না, আচার ও গুড় তৈরিতে তার বেশ সুনাম ছিল। 'অনামিকাস কিচেন' নামে ফেসবুক পেইজটি খুলে একটি বিকাশ নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া শুরু করেন যশোরের খেজুর গুড় ছাড়াও পাটালি, তেল, ঘি, মধুসহ নানা ধরনের নাড়ু ও আচারের। বেশ সাড়া পড়তে থাকে। তিনি আরও বলেন, ই-কমার্স একটা আদর্শ ব্যবসা অথবা একটা বৃহত্তর আদর্শ ব্যবসার অংশ বলতে পারেন। ইন্টারনেট ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একক বা দলগতভাবেও এই ব্যবসা পরিচালনা করা যায়। আর টাকা পাওয়া যায় ঘরে বসেই।'

## নিশাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে 'আপুর রান্না ঘর'

ফেসবুকে 'আপুর রান্না ঘর' নামে পেইজ খুলে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ফেলেছেন যশোরের বেজপাড়া আনছার ক্যাম্প এলাকার নিশাদ সিদ্দিকী। দৈনিক গ্রামের কাগজকে জানান, বিয়ে হলেও স্বামী সংসার থেকে আলাদা থাকেন অর্ধযুগ। এক মেয়ে সন্তানের জননী তিনি। অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে থাকে। তার রান্নায় জাদু আছে এমন কথা শোনেন আত্মীয় স্বজন ও ভাইবোনদের কাছ থেকে। এরপর জীবন চালানোর প্রশ্নে তিনি নামেন ই-কমার্সে। পুঁজি একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন, আর কিছু শুভানুধ্যায়ী ও স্বজন। তারা পেইজে শেয়ার দিয়ে জনবান্ধব করে তোলে। শুরু হয় তার যশোর শহরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সকাল-দুপুর খাবার সরবরাহ। অফিসে বসেই ঘরে রান্না স্বাদের খাবার অল্প দামে সরবরাহ করছেন এমন খবর তার ফেসবুক পেইজে দেন। বিয়ে, জন্মদিন, মুসলমানি অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের জন্যও থাকে তথ্য। ভালো সাড়া পান, অর্ডার আসতে থাকে আপুর রান্না ঘরে। মাত্র দুই বছর আগে এই অনলাইন ব্যবসা শুরু করে এখন তিনি ই-কমার্স উদ্যোক্তা। বর্তমানে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকার মতো তার উপার্জন। মাঝে বড় অর্ডার পেলে উপার্জন কখনও ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাঁড়ায়। নিশাদের তৈরি খাবারের মধ্যে রয়েছে সাদা ভাত, ছোট্ট মাছের চচ্চড়ি, সবজি, দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ঝোল এবং গরু ও খাশির মাংস। প্রতি ওয়াক্তে ১৫০ থেকে ২৫০ টাকার প্যাকেজ একজনের জন্য। আর নিরামিষ হলে ৬০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যে খাবার সরবরাহ করেন নিশাদ সিদ্দিকী।

তিনি জানান, শহরতলি কিংবা যশোর শহরে একটি হোটেল করতে গেলে কয়েক লাখ টাকা অ্যাডভান্স ও মাসে তিন থেকে ছয় হাজার টাকার উপরে ভাড়া গুণতে হয়। অথচ অল্প পুঁজিতে দোকান ছাড়াই ব্যবসা এই ই-কমার্স। তিনি জানান, একটু বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মঠ যে কোনো নারী হতে পারেন একজন সফল ই-কমার্সের উদ্যোক্তা। তবে, ই-কমার্স ব্যবসায় নামার আগে ঠিক করে নিতে হবে তাকে কোন পণ্যটি বেচতে হবে। পণ্য নির্বাচনের সময় দেখে নিতে হবে অনলাইনে যারা কেনাকাটা করেন তাদের কাছে সেটির চাহিদা কী পরিমাণ রয়েছে।

## শক্ত অবস্থানে 'পারফেক্ট পারসেল'র সাবরিনা

একটি ফেসবুক পেজের নাম 'পারফেক্ট পারসেল'। যশোরের নীলগঞ্জের তরুণ উদ্যোক্তা সাবরিনা আফাজ চালান এই পেইজটি। মেয়েদের ইমিটেশন গহনা, শাড়ি, চুড়ি, মেহেদি, চকলেট ও বিভিন্ন দিবসে প্রিয়জনের পছন্দের গিফট আইটেম সরবরাহ করেন তিনি। এছাড়া, নারীদের নানা ধরনের প্রসাধনী নিয়ে ব্যবসা তার। মাত্র এক বছর বয়স তার এই পেইজের।

তিনি জানান, সংসারে সহায়তা দিতে একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে কিছু করার আগ্রহ থেকে বেছে নেয়া এই ই-কমার্স। মাত্র ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। যশোরের বিভিন্ন দোকান থেকে নারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনীর প্যাকেজ পাইকারি কিনে তিনি সরবরাহ করেন। তার ঘরভাড়া দেয়া লাগেনা, ঘরে বসেই পছন্দের পণ্য সরবরাহ করেন। মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করছেন ঘরে বসেই। শুধু পারসেল তৈরি করে পাঠানোই তার কাজ। এখন তিনি আর্থিকভাবে শক্ত অবস্থানে আছেন। জানান,যশোরের নারীদের জন্য বেশ সম্ভাবনাময় এই ই-কমার্স।

## হরেকরকম নাড়ু ও পিঠা সরবরাহে সমৃদ্ধ জয়তীর ফেসবুক পেইজ

যশোরের বড় একজন নারী উদ্যোক্তা অর্চনা বিশ্বাস। জয়তী সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক তিনি। তার মোট কর্মীর ৯৮ শতাংশই নারী। জয়তী সোসাইটির রয়েছে নিজস্ব ফেসবুক পেইজ। পূজা ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে পিঠা, মোয়া, নাড়ুসহ রকমারি খাদ্য সরবরাহের ঘোষণা থাকে এই পেইজে। এ সংস্থার অনেক কর্মীরই ফেসবুক পেইজ রয়েছে। আর ভোক্তাদের একটি অংশ আসে ই-কমার্স প্রচারণা থেকে।

## ই-কমার্সে কেক বিক্রি করে উন্নতি কাশফিয়ার

শুধু কেক বানিয়ে ই-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রি করে উন্নতি করেছেন নারী উদ্যোক্তা কাশফিয়া ইসলাম মিথি। তার ফেসবুক পেইজের নাম 'ফারিয়াস পেস্টি'। অপর নারী উদ্যোক্তা নিশাত। তার পেইজের নাম 'কেক ট্রিট, কেক বাকের'। তারা শুধু বিভিন্ন দিবসে কেকের অর্ডার নেন। কাশফিয়া জানান, তিনি যশোর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। ভালো লাগা থেকে কেক তৈরি। ই-কমার্সে তার সাফল্য এসেছে। জানান, ঘরে বসেই তারা কেক তৈরি করে ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী। বাজার দরে গুণগত মানের কেক সরবরাহ করে তাদের পেইজের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। উপার্জন বাড়ছে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করে তার এই ব্যবসা শুরু। এখন তারা প্রতি মাসে ঘরে বসেই আয় করছেন ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। চকলেট ডাব কেক, মিনি কেক, সমুদ্র বিলাস কেক, বেনটো কেক, জার কেক, ভ্যানিলা কেকসহ বিভিন্ন থিম কেক সরবরাহ করে তার পেইজটি এখন বেশ জনপ্রিয়। ছোট্ট কেক চার টাকা থেকে শুরু করে প্রতি পাউন্ড ৬৫০ টাকায় সরবরাহ করেন কাশফিয়া।

## 'মহুয়া ফ্যাশন' দৃষ্টি কেড়েছে ভোক্তাদের

নারী উদ্যোক্তা খাদিজা খানম জানিয়েছেন, ২০০০ সালে ঘরোয়া পরিবেশে কাজ শুরু তার। ২০১০ সালে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ। তার বুটিক হস্তশিল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ২০২০ সাল থেকে 'মহুয়া ফ্যাশন' নামে ফেসবুক পেইজ চালু করেন। নতুনভাবে যুক্ত হন ই-কমার্সে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তার হাতে কাজ করা পোশাকের বাজার তৈরি হয়। প্রতি মাসে উপার্জন ৫০ হাজার টাকার মতো। জমি কিনে শহরের বকচরে পাকা বাড়িও নির্মাণ করেছেন। তার কাছ থেকে আরও ৩৫ জন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

## ফেসবুক পেইজের 'আরিফা ফ্যাশন হাউজ' ভাগ্য বদলে দিলো আরিফার

এটা ১০ বছর আগের গল্প। যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে খুলনায় পড়াশুনা ও সেখানেই বিয়ে হয় যশোরের ছয়ঘরিয়ার আরিফা সুলতানার। শিক্ষিত বেকার স্বামী সজীব। টিউশনি করে দু'জনের অতিকষ্টে চলছিল দিন। একইসাথে চাকরির জন্য চেষ্টা করলেও জোটেনি। এরপর ২০১৮ সালে ই-কমার্স উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন আরিফা। 'আরিয়া ফ্যাশন হাউজ' নামে পেইজ খুলে ই-কমার্স ক্যারিয়ার শুরু তার। এখন বছরে আয় তিন লাখ টাকা। মাসে পণ্য বিক্রি হয় পাঁচ লাখ টাকার। আর ঈদ ও পূজা পার্বণে বিক্রি হয় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মতো।

আরিফা বলেন,'অনলাইনে ব্যবসা গতানুগতিক কাজ থেকে কিছুটা আলাদা। কথা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যবসা। অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আসলে শুরু থেকেই ইচ্ছে ছিল পোশাক নিয়ে কাজ করার। নিজের যেহেতু নতুন নতুন ডিজাইনের তৈরি পোশাক ও হাতের কাজের থ্রিপিসের প্রতি চরম দুর্বলতা কাজ করে, তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে ওটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।'

এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ২৫ হাজার করে দু'বারে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে অল্প পরিসরে কাজ শুরু। বাজারে আসা নতুন নতুন কাপড় কালেকশন করে বিজ্ঞাপন দেয়া শুরু করেন। মেয়েদের থ্রিপিস, শাড়ি, ছেলেদের পাঞ্জাবি, টুপি, সোয়েটার, ছোটদের মনকাড়া ডিজাইনের পোশাকের সম্ভার সাজিয়ে দিয়ে পেইজে তুলে দিতেন। এরপর অর্ডার আসা শুরু করে। করোনাকালীন ঘরে বসে থাকার সময় ই-কমার্স উদ্যোক্তা হন তিনি। তিনি জানান, অনেকেই আছে কোনো প্রকার পরিকল্পনা ছাড়া শুধুমাত্র ঝোঁকের বসে ই-কমার্সে নেমে পড়ছেন। এতে যেমন তারা সফলতার মুখ না দেখে হতাশায় পড়ে যাচ্ছেন তেমনি যারা ইতিমধ্যে স্বচ্ছ উপায়ে এই সেক্টরে ব্যবসা করছেন তারাও অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ছেন।

তার বক্তব্য, ই-কমার্স ব্যবসায় নামার আগে সঠিকভাবে জানতে হবে আসলে ই-কমার্স কী, ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক গাইডলাইন, ই-কমার্স নিয়ে সচেতনতা ইত্যাদি। পণ্যটির দাম নির্ধারণ, এখন বাজার ধরতে কতটা ছাড় দেয়া সম্ভব সেই হিসেবটাও আগে কষে নিতে হবে। অনেক সময় প্রতিযোগীদের কাছ থেকে বাজার ছিনিয়ে নিতে বড় রকমের ডিসকাউন্ট দিতে হয়। আরও নজর দিতে হয় অর্ডার অনুসারে পণ্য যেন ঠিক মতো ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়া যায় অর্থাৎ ডেলিভারি সিস্টেম ভালো রাখা জরুরি। তা না হলে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ জমবে। ই-কমার্সে পণ্যের গুণগত মানের দিকে বেশি নজর দিতে হয়।

দৈনিক গ্রামের কাগজকে সাক্ষাৎকার দেয়া নারী উদ্যোক্তা নিশাত সিদ্দিকী বলেন,'ই-কমার্স এখন বেশ জনপ্রিয়। যেকোনো নারী ইচ্ছা করলে হতে পারেন সফল উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের বাজারে ই-কমার্সের পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। এটাই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি পুঁজি বলা যেতে পারে।'

## যা বলছেন কর্মকর্তারা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যশোরের উপপরিচালক আনিছুর রহমান জানিয়েছেন, ই-কমার্স বাজারে ডলারে যশোরের নারী উদ্যোক্তাদের উপার্জন ও বিক্রি যোগ হচ্ছে। ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে কয়েকজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ভালো করছেন। এদের মধ্যে নৃত্যশিল্পী আনিকা জাহান অনামিকার কথা বলা যায়। সরকারি এমএম কলেজের ছাত্রী। 'রাউফা অনামিকা ব্লগস' নামে ফেসবুক পেইজে সে বিভিন্ন ভিডিও কনটেন্ট আপ করে। তার পেইজটি এখন সমৃদ্ধ। চার লাখের উপরে ভিউয়ার হওয়ায় তার উপার্জন ভালো। আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর জান্নাত সোহাগীর 'সোহাগী ব্লগস', জেবুন্নেছা জেবার 'জেবা ব্লগস'সহ আরও অনেকে ই-কমার্সে ভালো করছেন।

নারী উদ্যোক্তা ও তাদের ই-কমার্স নিয়ে যশোর সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা রনজিত দাশ জানিয়েছেন, উপজেলায় ১৩০টি মাল্টিপারপাস সমবায় সমিতির ২০ টির প্রধান নারী। এদের মধ্যে ১৩ জন নারী ফেসবুকে পেইজ খুলে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করেন। অনেকে ভালো করছেন। নতুনরা এগিয়ে আসলে তাদের সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান তুহিন জানিয়েছেন, তার দপ্তর থেকে

নিবন্ধিত ১৭৯ টি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬ জন নারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান। এদের মধ্যে সাতজন ই-কমার্সের সাথে জড়িত। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত নানা সামগ্রী তারা বিক্রি করছেন বাজারে। তাদের এই বিক্রিতে এখন যুক্ত হয়েছে ই-কমার্স। বেকার সমস্যা সমাধানে ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নুতন কেউ ই-কর্মাসে যুক্ত হতে চাইলে সরকারিভাবেও সহায়তার চেষ্টা করা হবে।

শেষ পর্ব

# অদম্য সাতজনের কঠিন সময়ের গল্প

২০১৯ সালের শেষের দিকের কথা, করোনা সংক্রমণে চারপাশে তখন বিপদ। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বাজার ও মার্কেটে বেচাকেনায় ধস চলছিল। সেই কঠিন সময় পাড়ি দেয়ার সময় দিশেহারা না হয়ে 'আরিয়া ফ্যাশন' চালুর কথা ভাবেন কলেজ ছাত্রী আরিফা। ক্যারিয়ারের শুরুতেই ইচ্ছে ছিল একজন সফল উদ্যোক্তা হবেন। সেই ইচ্ছে শক্তিকে পুঁজি করেই ব্যবসা বড় করার স্বপ্ন দেখেন। যদিও এর আগে ২০১৮ সালে ছোট্ট পরিসরে ফেসবুকে ই-কমার্স ব্যবসা শুরু তার। প্রথমে কেনাবেচা কম হলেও হাল ছেড়ে দেননি। মনোবল ধরে রেখে সেই কঠিন সময় পার করেছেন। অবশেষে সফলও হয়েছেন। এখন বছরে আয় তিন লাখ টাকা। মাসে পণ্য বিক্রি হয় পাঁচ লাখ টাকার। আর ঈদ ও পূজা পার্বণে বিক্রি ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মতো। অদম্য নারী উদ্যোক্তা আরিফার মতোই যশোরের নারী উদ্যোক্তা খাদিজা খানম, নাজমুন নাহার শিরিন, সুফিয়া মাহমুদ রেখা, ফারহানা বেগম, আশরাফোন খাতুন আশা ও তানিয়া খাতুন শিফা জীবন সংগ্রামে আজ জয়ী। কেউ মাশরুম চাষে, কেউ ছাদ বাগান ও ভার্মি কম্পোস্টে, কেউ ঘরে তৈরি খাদ্যে, কেউ বিউটি পার্লারে, আবার কেউ অনলাইনে হস্তশিল্পে। কেউ ই-কমার্সকে কাজে লাগিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। জয়িতা স্বীকৃতিও পেয়েছেন এদের কয়েকজন। গ্রামের কাগজের কাছে তারা জানিয়েছেন তাদের কঠিন সময় পার করার গল্প।

## অভাবে দু'বেলা ভাত পাননি আশা এখন মাসে আয় ৩০ হাজার টাকা

গত ৬ অক্টোবর দুপুরে যাওয়া হয় যশোর সদর উপজেলার জঙ্গলবাঁধাল খালপাড়ার আশরাফোন খাতুন আশার বাড়িতে। বাবা আত্তাপ মন্ডল। ব্যারেল ক্লেভ মেশিনে স্পন (মাশরুম চাষের ছোট পাত্র) জীবাণুমুক্ত করতে জ্বাল দিচ্ছিলেন আর কথা বলছিলেন তিনি। আশা জানান, কম বয়সে বিয়ে হওয়ার পরে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার। সাত বছর আগে গর্ভে সন্তান রেখে মারা যান স্বামী জাবেদ আলী। সাত বছরের মেয়ে জিনিয়াকে নিয়ে তার জীবন সংগ্রাম শুরু। এরপর তার জীবনজীবিকা আর ভালোবাসার নাম হয়ে ওঠে মাশরুম চাষ। মাশরুমের বীজ উৎপাদন, স্পন ও সিলিন্ডার প্রস্তুত করে বিক্রি এবং চাষ করা তার কাজ।

তিনি জানান, এক সময় অভাবের কারণে দু'বেলা ভাত খেতে পারতেন না। বর্তমানে এখন মাসে আয় করেন প্রায় ৩০ হাজার টাকা। ২০০ থেকে ৩০০ স্পন ও খড়ের সিলিন্ডার নিয়ে তিন শতক জমিতে তার মাশরুমের জগৎ। পাঁচ, দুই ও এক কেজির স্পন এবং খড়ের সিলিন্ডারে বীজ বপন করেন তিনি। পাঁচ কেজি পর্যন্ত হয় সিলিন্ডার। এর নীচে সব স্পন। পাঁচ কেজির সিলিন্ডার থেকে দু'কেজি, দু'কেজির স্পনে পান এক কেজি আর এক কেজির স্পনে পান ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম মাশরুম। তিনি এসব মাশরুম খুচরা ও পাইকারি বিক্রি করেন। কাঠের গুঁড়ো, ধান, বিছালি, খড়, নেট আর পিপি তার পুঁজি। তিনি এক কেজির স্পন ৫০, দু'কেজির স্পন ৮০ ও পাঁচ কেজির সিলিন্ডার বিক্রি করেন ১৪০ টাকায়। এছাড়া, মাশরুম পাইকারি বিক্রি করেন ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি। যশোরের বাজার ছাড়াও কুষ্টিয়ার নুরুন নাহার বেগম, নড়াইলের মহুয়া বেগম তার কাছ থেকে মাশরুম নেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরের বড় বড় ফাস্ট ফুডের দোকান-চাইনিজ রেস্তোরাঁয় তার উৎপাদিত পণ্য যায়। তার কাজ দেখে এলাকার সুমি বেগম, রাহাতন, সোনিয়া

কোহিনুরসহ অনেকেই ছোট্ট পরিসরে উৎপাদন করে আয় করছেন।

তাদের দেখাদেখি আরও অনেক নারী মাশরুম চাষ করতে চান। কিন্তু তাদের কোনো পুঁজি নেই। ঋণ পেলে তারা এই লাভজনক ব্যবসা শুরু করতে পারবেন।

## শিফার কাছে শিখেছেন অনেক প্রতিবেশী, তাদের দরকার পুঁজি

তানিয়া খাতুন শিফা। স্বামী সালাউদ্দিন। বাবা আজম খান। শিফার তিন সন্তান। দু'ছেলে বায়েজিদ ও মুজাহিদ। আর মেয়ে তাসনিয়া। ২০০৪ সালে এসএসসি পাস করেন। বিয়ে ও সংসারের কারণে পড়াশুনা এগোয়নি।

৮ অক্টোবর তানিয়া খাতুন শিফার বাড়িতে যান প্রতিবেদকরা। ওইসময় তিনি জানান, অভাবের সংসারে স্বামীকে সহায়তা করতেই দু'বছর আগে শুরু করেন মাশরুম চাষ। ৫০টি স্পন নিয়ে কাজ শুরু তার। নিজের বাড়িতে তাক তৈরি করে শহরের হর্টিকালচার সেন্টার থেকে স্পন ও বীজ নিয়ে উৎপাদন শুরু করেন তিনি। একটি এক কেজির স্পন থেকে ২০০ থেকে ৭০০ গ্রাম উৎপাদন হয় তার। একবারের স্পনে মাশরুম তোলা যায় তিন থেকে চারবার। স্থানীয়ভাবে তিনি খুচরায় বিক্রি করেন প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে। স্থানীয় কয়েকটি বাজার ও মোড়ের ফাস্ট ফুড ও ভাজাভুজির দোকানি তার কাছ থেকে মাশরুম নেন।

শহরের মণিহার সিনেমাহলের সামনের জামাল উদ্দিন, মাইকপট্টির শামীম আহমেদসহ কয়েকটি দোকানেও তার মাশরুম চলে। তারা জানান, মাশরুম থেকে তৈরি চপ, বড়া, ফ্রাই, আচার অনেক সুস্বাদু। মাশরুমের গুঁড়া থেকে তৈরি হচ্ছে বিস্কুট, স্যুপ, কেক ও জেলি। তবে, যশোরে চপ ও স্যুপ জনপ্রিয়।

শহরের মুজিব সড়কের আড্ডাখানা, রাজগঞ্জ রোডের ক্যাফে অস্থিরসহ অনেকগুলো দোকান মাশরুমের চা বিক্রি করে এখন জনপ্রিয়। শিফার এক সময় কাঁচা বাড়ি থাকলেও মাশরুম চাষের বদৌলতে বর্তমানে পাকা বাড়ি। ব্যবসার প্রসারে তিনি চান ব্যাংক ঋণ। ঋণ পেলে ব্যবসা আরও বড় করে এলাকার নারীদের কাজে লাগাতে পারবেন তিনি। তার মতো এলাকার মিটন হোসেনের মেয়ে মুসফিয়া খাতুন ও ফারুক হোসেনের স্ত্রী সেলিনা বেগম মাশরুম চাষ করতে চান। তারা জানান, প্রতিবেশী শিফার কাছ থেকে সব শিখে ফেলেছেন। তারা ঘরের বারান্দায় অল্প করে মাশরুম চাষ করছেন। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে তাদের পুঁজি দরকার বলে জানান।

## বহুগুণের অধিকারী ফারহানা বেগম এবার ভার্মি কম্পোস্টেও সফল

যশোরে পুরানো মাশরুম চাষি ফারহানা বেগম। সদর উপজেলার মোবারককাটি গ্রামের করামনের স্ত্রী। মাশরুম চাষ করে জীবন বদলে ফেলেছেন তিনি। শুধু মাশরুম চাষ করেই যশোরের নারীরা এগিয়ে যেতে পারেন বলে তার বিশ্বাস। বহুগুণের অধিকারী তিনি মাশরুমে সফলতার পর এবার ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অল্প জমিতে নিজের বাড়িতে এই জৈব সার

উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হওয়া যায় তার উদাহরণ তিনি।

২০১২ সালে মাশরুম চাষে আসা ফারহানা এলাকার ৪০ জনের এক গ্রুপকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাদের সবার সংসার চলে সরাসরি মাশরুম চাষ করে। তার মতো এলাকার অনেক নারীর আর্থিকভাবে ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ছাদ কৃষি, মৎস্য চাষ, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালনে সাফল্য দেখিয়ে এবার হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনে।

জীবন সংগ্রাম নিয়ে কথা হয় তার সাথে। জানান, ২০১৮ সালে পেয়েছেন বঙ্গ কৃষি পদক। এছাড়া, ২০২০ সালে মহিলা অধিদপ্তর থেকে জয়িতা পদক পান ফারহানা। একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ঘরে বসে অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বিভিন্ন চাষে ভাগ্য উন্নয়ন ও অন্য নারীর ভাগ্যের পরিবর্তনে অবদানের জন্য এই পুরস্কার। যশোরে পুরুষের চেয়ে মাশরুম চাষে, ছাদ কৃষিতে, হস্তশিল্পে এমনকি ই-কমার্সেও মেয়েরাই এগিয়ে। বিশেষ করে অল্প পুঁজিতে ঘরে বসে অধিক পুষ্টি ও লাভের ফসল মাশরুম। ফারহানার মতে, অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনে চলে যাওয়া নারীদের এসব চাষে সম্পৃক্ত করে পুনর্বাসনের চিন্তা করতে পারে সরকার।

## উদ্যোক্তা রেখার দাবি ঝরে পড়া রোধে চাই সরকারি উদ্যোগ

উদ্যোক্তা হিসেবে ১৯৯২ সালে কাজ শুরু সুফিয়া মাহমুদ রেখার। বুটিক কাজ দিয়ে শুরু; পরে ১৯৯৪ সালে শুরু করেন বিউটি পার্লার। সানন্দা বিউটি পার্লার ও সানন্দা বুটিকস নাম দিয়ে দু'টি প্রতিষ্ঠান চালু হয় তার। একসাথে চলে উদ্যোক্তা তৈরির কাজ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এখন সফল ও স্বাবলম্বী নারী । কথোপকথনে তিনি জানান, স্বামীর সহায়তা ছাড়াই টানা ২০ বছর তিনি পথ চলছেন। পেয়েছেন জয়িতা পুরস্কারও। দুই ছেলে মেয়ে মাসুম বিল্লাহ সাকিন ও মাসুদা সুলতানা স্বপ্নার পড়াশুনা খরচ চলে। উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি তার ফার্মে ১২ জন নারীকেও কাজ দিয়েছেন একযুগ আগে থেকে। তাদের জীবিকাও চলছে এই বুটিক ও বিউটি পার্লার থেকে। তার মতো একইভাবে একই কাজের মাধ্যমে এখন জেলায় ৭২ জন উদ্যোক্তা। তাদের এখন সংসার চলছে। এছাড়া, তিনি জেলা উইমেন্স বিউটি পার্লারের সভাপতি হিসেবে সবার খোঁজখবর রাখেন। তাদের দু' একজন ঝরে গেলেও বেশিরভাগই উদ্যোক্তা হিসেবে সফল। বড় পরিসরে সফলতায় এগিয়ে যাওয়া উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন যশোরের মায়া রহমান, সুমি শেখ, শ্রাবনী আক্তার, মির্জা মাসুমা আর সুমি, উম্মে কলুসুম হিরা আফরোজা আক্তার তিথিসহ অনেকে। যশোরের উদ্যোক্তা নারীরা পুরুষের সাথে সমান তালে সংসারে অবদান রাখছে। আর দিন দিন নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে। এ জেলায় পাঁচ শতাধিক সফল উদ্যোক্তা রয়েছেন। আবার ঝরেপড়া উদ্যোক্তাও রয়েছেন। ঝরেপড়া রোধ করতে সরকারি উদ্যোগ, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে সচেতন করতে হবে।

## নাজমুন নাহার শিরিন এখন ৩০ জনের ব্যাচের প্রশিক্ষণ দেন প্রতি মাসে

সফল নারী উদ্যোক্তা যশোরের বিরামপুর কালীতলার নাজমুন নাহার। তিনি জানিয়েছেন, তার সফলতার কথা। প্রথমে শখ থেকে ২০০৬ সালে সামাজিক কাজে নামেন তিনি। সাজ বিউটি পার্লারের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান শুরু তার। এরপর অ্যাচিভ শিশু ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গঠন করে ২০১৫ সাল থেকে জোরেশোরে উদ্যোক্তা তৈরির কাজ শুরু করেন। তিনি প্রতি মাসে ৩০ জনের একটি করে ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেন। তিনি জানান, অনেকে ঝরে যান অনেকে টিকে যান। যশোর শহর ও শহরতলিতে তার কাছ থেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩০ জন এখন সংসারের হাল ধরেছেন। সংসার চালানোসহ সন্তানের খরচ যোগাতেও কাজ করছেন। তার মতোই নারী উদ্যোক্তা রঙের ছোঁয়ার মুনমুন রহমান, ইমনি ব্লক  হাউজের শাহানাজ ইসলাম, লাবিলা বিলকিসসহ অনেকের নাম বলা যায়। তার কাছ থেকে নকশি কাঁথা থ্রি পিসে কারুকাজ শিখে, গাছ লাগিয়ে বনায়ন করেও স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেকে।

তিনি বলেন, যশোরে নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে। বিগত বছরগুলো থেকে প্রতি বছরই সংখ্যায় বাড়ছে। প্রথমে তার অ্যাচিভ থেকে পাঁচ-সাতজনের ব্যাচ বের হলেও এখন ৩০ জনের ব্যাচ বের হচ্ছে। কিছু ঝরে গেলেও আনুপাতিকভাবে স্বাবলম্বীদের হার বাড়ছে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না, তিনি তার নিজে এবং নিজের দু'মেয়ে নাওমীন নাওয়ার ও তাসনুভা তানভীনের পড়াশুনার খরচ নিজেই যুগিয়ে থাকেন। উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি দরিদ্রদের সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করতে পারেন। আর এসব কাজে আনন্দ পান। একজন উদ্যোক্তা বলেই সব সম্ভব হচ্ছে। তিনি নারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ।

## বিদেশিরাও আসেন উদ্যোক্তা খাদিজার সুঁচি শিল্পের ভান্ডারে

২০২২ সালে জয়িতা পুরস্কার পাওয়া নারী উদ্যোক্তা খাদিজা খানম জানিয়েছেন, ২০০০ সালে ঘরোয়া পরিবেশে কাজ শুরু তার। ২০১০ সালে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ। তার বুটিক হস্তশিল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি ১৪ জন টিম লিডার ও সাতজন কর্মী নিয়োগ দিয়ে প্রতিমাসে প্রায় পাঁচ থেকে সাতশ' থ্রিপিসের হাতের কাজ উঠাতেন। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তার হাতের কাজের পোশাকের বাজার তৈরি হয়। তার সংসারে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অভাব অনটন থাকলেও এখন সফল উদ্যোক্তা তিনি। শাড়িতেও কাজ করেন খাদিজা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশি অনেক সৌখিন ক্রেতা ছুটে আসেন তার কাছে। প্রতি মাসে উপার্জন ৫০ হাজার টাকার মতো। জমি কিনে শহরের বকচরে পাকা বাড়িও নির্মাণ করেছেন। তার কাছ থেকে আরও ৩৫ জন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, যারা নিজের উপার্জনের টাকায় সংসারে সহযোগিতা করছেন। তার প্রতিষ্ঠা করা 'মহুয়া সমাজ কল্যাণ সংস্থার' মাধ্যমে ২০১৫ সালে জেলাব্যাপী কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে দু'হাজারের বেশি নারীকে তিনি সম্পৃক্ত করেছেন এই বুটিক শিল্পের কাজে। যারা সপ্তাহে বা মাসে একটি দু'টি করে থ্রিপিস বা নকশি কাঁথায় সুঁই সুতোর কাজ করেন। তারা সংসারে কিছুটা হলেও সহায়তা করতে পারছেন। ২০১৫ সালের পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তার মহুয়ার ব্যানারে তৈরি হওয়া ৩৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে এখনও টিকে আছে ৩০ জন। বুটিক সুঁচি শিল্প ছাড়াও অন্য নানা সেক্টরেও নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে।

গ্রুপ-৪

# সীমান্তে মানব পাচার

আসাদ আসাদুজ্জামান ও জাহিদ আহমেদ লিটন

# লেখক পরিচিতি

## আসাদ আসাদুজ্জামান

আসাদ আসাদুজ্জামান বর্তমানে দৈনিক গ্রামের কাগজের নির্বাহী সম্পাদক। ২০০০ সালে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিয়ে চিফ রিপোর্টার ও নিউজ এডিটর পদে কাজ করেন। সাংবাদিকতায় তার অভিজ্ঞতা ২৫ বছরের। স্কুলজীবন থেকে কবিতা লিখলেও ১৯৯০ সালে দৈনিক ভোর-এ যশোর প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। এমআরডিআই, বিবিসি অনলাইন মিডিয়া একশান, সাকমিডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে সাকমিড ফেলোশিপ ও পুরস্কার লাভ করেন। যশোরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

## জাহিদ আহমেদ লিটন

জাহিদ আহমেদ লিটন ১৯৯০ সালে দৈনিক কল্যাণ পত্রিকায় যুক্ত হয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে স্থানীয় দৈনিক লোকসমাজ, দৈনিক গ্রামের কাগজ, ঢাকার দৈনিক খবর, দৈনিক নয়াদিগন্ত, বৈশাখী টেলিভিশনে সাংবাদিকতা করেছেন। এছাড়া, তার লেখা দৈনিক প্রথম আলো, মুক্তকণ্ঠ, ইনকিলাব, সংগ্রাম, চিত্রবাংলা, যশোরের কাগজ, পাঠকের কথাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি দৈনিক গ্রামের কাগজের সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। জাহিদ আহমেদ যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে ১৯৯১ সালে বিএ পাস করার পর আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ২০০৬ সালে শহীদ মশিয়ুর রহমান ল'কলেজ থেকে এলএলবি পাস করেন। এছাড়াও ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি যশোরের নাট্যাঙ্গনে নিয়মিত অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পর্ব: ০১

# বিরাশি ঘাটে চার শতাধিক দালাল সক্রিয়

সুন্দরবন ঘেঁষা সাতক্ষীরার নীলডুমুর থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪৪৪ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কমপক্ষে ৮২টি স্থানের সন্ধান মিলেছে, যেগুলো ভারতে মানব পাচারের 'ট্রানজিট পয়েন্ট' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব পয়েন্ট পাচারকারীদের 'ঘাট' বলে পরিচিত।

'ঘাট' শব্দটি শুনলে যেমন নদী, খাল, বিল বা যে কোনো জলাশয় নৌকা, লঞ্চে বা ফেরিতে পেরুনোর ঘাট মনে হয়, এগুলো সেরকম কিছু নয়। এগুলো সীমান্ত ঘনিষ্ঠ চিরচেনা সাধারণ গ্রামীণ ঘাট। কিন্তু ব্যবহৃত হয় মানব পাচারের 'গোপন ঘাট' হিসেবে। এসব ঘাটের পাশের বাড়িতে নারী শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ স্বল্প সময়ের জন্য রাখা হয়, আর সুবিধামতো সময়ে পাচার করা হয় ভারতে। এই কাজে পেশাদার পাচারকারী সিন্ডিকেট আছে, তাদেরকে সহায়তা করে বাড়তি আয় করে ঘাটের পাশের অধিবাসীরা। গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানে বিভিন্ন সময় যশোর ও ঝিনাইদহের একাধিক সীমান্ত পথে পাচারের আগে-পরে উদ্ধার হওয়া বহু ব্যক্তির সাথে কথা বলে এই ঘাটগুলোর চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। সেসব তথ্যের সত্যতা মিলেছে দালাল চক্রের সাথে যুক্ত কারও কারও সাথে কথা বলে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভারতের সাথে সীমান্ত ঘেঁষা এসব ঘাটের সাথে মাকড়শার জালের মতো বিস্তৃত সম্পর্ক রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানব পাচারকারী সিন্ডিকেট সদস্যদের।

বহুকাল ধরে চোরাচালান কিংবা মানবপাচারের জগতে মাত্র আট-দশটি ঘাটের কথা আলোচিত হয়ে আসছে। গ্রামের কাগজের বিগত কয়েক মাসের অনুসন্ধানে কমপক্ষে ৮২টি নিয়মিত ব্যবহার করা ঘাটের পাশাপাশি আরও দু-তিনটি অনিয়মিত ব্যবহার করা ঘাটের খোঁজ মিলেছে। প্রতিটি ঘাটে দালাল চক্র আছে, কোথাও তারা সংখ্যায় বেশি, কোথাও কম। গড়ে প্রতি ঘাটে পাঁচজন করে দালাল থাকলে ৮২টি ঘাটে ৪১০ জন দালাল সক্রিয়। যাদের সাথে শুধু যশোর বা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেরই না, গোটা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য দালালের রয়েছে যোগাযোগ। যার সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে পাচারকারী চক্রেরও কেউ জানে না। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মানবপাচার চক্রের দালালরা কখনো ভুল বুঝিয়ে, কখনো মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নারী-পুরুষ-শিশু জোগাড় করে সীমান্তবর্তী এসব 'ঘাট' সংশ্লিষ্ট দালালদের হাতে তুলে দেয়। পাচারের শিকার হওয়া এবং পাচারকারী চক্রের দালাল মিলে কমপক্ষে ২৫ জনের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

ঘাট এলাকার দালাল চক্র থেকে জানা যায়, একসময় পাচারকারীদের কাছে চৌগাছা উপজেলার কাবিলপুর ঘাট বেশ 'প্রিয়' ছিল। কয়েক দশক আগে যখন ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেনসিডিল চোরাচালান শুরু হয়, তখন সীমান্তের এই ঘাটটি দিয়ে কপোতাক্ষ নদ পেরিয়ে নৌকায় করে ফেনসিডিল আনা হতো। পরে আসে গরু, এরপর শুরু হয় মানবপাচার। এক সময় কপোতাক্ষ নদ নাব্যতা হারায়, থেমে যায় জলের স্রোতধারা, বন্ধ হয় নৌকা চলাচল। বর্তমানে এই ঘাটে ডোঙায় করে (তাল গাছ দিয়ে নির্মিত এক ধরনের সরু জলবাহন, যা অগভীর জলেও ভাসে এবং তার ওপর চড়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষ মাছ ধরে) মানব পাচার হচ্ছে। তবে, নৌকায় করে যত বেশি মানুষ একবারে পাচারের জন্য নেয়া যেত, ডোঙায় তত মানুষ নেয়া যায় না। একজন করে নেয়া লাগে।

পাচারের শিকার মানুষ হাত বদলের সময় সীমান্তের এই ঘাটের দালালদের সাথে প্রথম পরিচিত হয়। তাদেরকে ঘাটে নিয়ে আসে গোপন দালালরূপী পরিচিতজনরা। এসব ভিকটিম এবং তাদের পরিচিত দালালদের ঠিকানা ছড়িয়ে আছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। অনুসন্ধানকালে নড়াইল, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদীর দালাল ও ভিকটিম পাওয়া গেছে। তারা সবাই স্বল্প আয়ের দরিদ্র পরিবারের সদস্য। এছাড়াও কয়েকজন মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গার সন্ধান মিলেছে, যারা পাচারকালে উদ্ধার ও আটক হয়েছিল।

## পাচার হয়ে যায় কোথায়?

ভিকটিমদের সাথে কথা বলে তথ্য মিলেছে, পাচারের শিকার অধিকাংশ নারী ও মেয়ে শিশুকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয়া হয়। অল্পসংখ্যক নারী ও শিশুদেরকে বিভিন্ন ধনী পরিবারে গৃহপরিচারিকা হিসেবে বিক্রি করে পাচারকারীরা। সেখানেও তারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। বিক্রি করা নারীদের মধ্যে কোলকাতার সোনাগাছী যৌনপল্লীতে অপেক্ষাকৃত কম নারীকে রাখা হয়। কারণ সেখানে বাংলাদেশের অনেক মানুষের যাতায়াত রয়েছে। পাচার হওয়া নারীদের সোনাগাছী ছাড়াও পাঠানো হয় ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মুম্বাই, দিল্লি প্রভৃতি এলাকায়। সেসব এলাকায় বাঙালি মেয়েদের চাহিদা বেশি বলে জানিয়েছেন উদ্ধার হওয়া ভিকটিমরা ।

## বিশাল পথ রূপগঞ্জ থেকে মহারাষ্ট্র!

ভারতের মহারাষ্ট্রের একটি যৌনপল্লী থেকে উদ্ধার করে আনা পাঁচ নারীর সাথে কথা হয়। এই পাঁচজনের পাচারের কাহিনি প্রায় একইরকম। এদের একজনের নাম দেয়া

যাক 'ক'। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গঙ্গানগর। 'ক'-এর ছিল অভাবের সংসার। স্বামী একটি কারখানায় স্বল্প মজুরিতে কাজ করতেন। তাদের এলাকার সেতু আপা নামে পরিচিত এক নারী ভারতের মহারাষ্ট্রে থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি বাড়িতে আসলে 'ক'দের বাড়িতে যেতেন এবং গল্পগুজব করতেন। তিনি 'ক' এর দারিদ্র্যের কথা শুনে 'উন্নত জীবন' গড়তে তার সাথে মহারাষ্ট্রে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানে হাতের কাজ, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে উন্নত জীবন গড়া সম্ভব বলে জানান। যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২০-২৫ হাজার টাকা খরচ হবে বলে জানান 'সেতু আপা'। যা 'ক'-কে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করতে হবে না। মহারাষ্ট্রে গিয়ে কাজ করে পরিশোধ করতে পারবেন বলে সেতু তাকে জানান।

সেতুর কথামতো স্বামীর সম্মতি নিয়ে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি রওনা হন। বাড়ি থেকে 'ক' রূপগঞ্জের রূপসী থেকে সিএনজিতে ঢাকার যাত্রাবাড়ী আসেন। সেখান থেকে সিএনজিতে করে গাবতলীতে এসে যশোরের বেনাপোলগামী একটি বাসে ওঠেন। ভোরবেলা বেনাপোলে নেমে সীমান্তবর্তী একটি বাড়ির ঝুপড়ি ঘরে তাকে রাখা হয়। ওই বাড়িতে ভারতে যাওয়ার জন্য বিকেলের মধ্যে আরও ৮-১০ জন এসে ওঠেন। বাড়ির কর্তার পরিচয় 'ক' জানতে পারেননি। তাকে দুপুরে ওই বাড়িতে ভাত খেতে দেয়া হয়। তিনি দেখেন সেতু ওই বাড়ির সবারই পরিচিত। সেতু তাকে জানান, ওপারে বিএসএফের টহল চলছে। তারা রাতে বর্ডার পার হবে।

কথা মতো গভীর রাতে 'ক'সহ ৮-১০ জনকে সীমান্তে একটা কাঁটাতারের বেড়ার পাশে আনা হয়। বেড়ার এপাশে চার-পাঁচজন এবং ওপাশে আরও পাঁচ-ছয়জন মিলে বাঁশ দিয়ে তারকাঁটার বেড়া ফাঁকা করে ধরেন। সেসময় সেতু এবং 'ক' সহ ৮-১০জন সীমান্তের ওপাশে চলে যান। ওপারে যাওয়ার পর কিছুদূর হেঁটে একটি বাড়ির ঝুপড়ি ঘরে রাতের বাকি সময় পার করতে হয় তাদের। এসময় সেতু 'ক'কে কালু নামে এক যুবকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই কালুই তাকে কাজের বন্দোবস্ত করে দেবেন বলে জানান।

রাত শেষ হলে কালু ও সেতুর নেতৃত্বে সেখান থেকে বাসে করে হাওড়া স্টেশন এবং এরপর বাসে করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মহারাষ্ট্রের বকুলনগরে তাকে নামানো হয়। সেখানে খাবার খেতে বসিয়ে 'যোগাযোগ' করার জন্য বাইরে যাচ্ছেন বলে কালু ও সেতু চলে যান। ঘণ্টাখানেক পর সেতু ও কালু হাসি মুখে ফিরে আসেন এবং জানান,'তাদের কাজ রেডি হয়ে গেছে, আজই সেখানে যেতে হবে।' সেখান থেকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের শানলিপোনার বকুলনগরের যৌনপল্লীর পাঁচ নম্বর গলিতে বিক্রি করে দেয়া হয় তাকে। এসময় সেতুর কাছে কান্নাকাটি করলে 'ক'-কে বলা হয়,'আপাতত সেখানে থাকো, এরমধ্যেই ২০-২৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে কাজ করে তার টাকা পরিশোধের পর অন্য কাজ দেয়া হবে।'

সেই পাঁচ নম্বর গলিই তখন 'ক' এর ঠিকানা হয়ে যায়। সেখানে থাকাকালীনই ২০২৩ সালের ২২ অক্টোবর হঠাৎ মহারাষ্ট্র পুলিশ অভিযান চালায়। সেখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় 'ক', সেতু এবং কালুসহ সাতজনকে আটক করে পুলিশ। সেখান থেকে আদালতের মাধ্যমে কালু ও সেতুকে কোলকাতা জেলখানায় পাঠানো হয়। আর অন্য পাঁচজনকে ভেনেদী নিবেদিতা সংস্থার শেল্টার হোমে রাখা হয় ছয় মাস।

এরমধ্যে মানব পাচার প্রতিরোধে কাজ করা 'রাইটস যশোর' বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের ফলে 'ক'সহ ওই পাঁচজনের আদালতের মাধ্যমে অপর একটি শেল্টার হোম শিংলি রেসকিউ ফাউন্ডেশনে আরও ছয় মাস রাখা হয়। উভয় শেল্টার হোমেই তাদের শেখানো হয় হাতের এবং সেলাইয়ের কাজ।

এরমধ্যে অনেক কাগজপত্র আদান প্রদানের পর উভয় দেশের মধ্যস্থতায় এবং রাইটস যশোরের উদ্যোগে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এই পাঁচজন বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। গত ৩ অক্টোবর রাইটস তাদের বাড়ির লোকজনের কাছে হস্তান্তর করে।

শুধু 'ক' একা নয়, 'খ' 'গ' 'ঘ' এবং 'ঙ' এর পাচারের কাহিনি একই। শুধু তাদের বাড়ির ঠিকানা ভিন্ন। তারা পাঁচজনই দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তারা পাঁচজনই যে বিবরণ দিয়েছেন,

তাতে জানা গেছে, ভেনেদী নিবেদিতা সংস্থা এবং শিংলি রেসকিউ ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশের আরও অনেক নারী রয়েছেন। নানা কারণে তারা দেশে ফিরতে পারছেন না। জেলখানায়ও অনেকে রয়েছেন বলে তারা জেনেছেন। এছাড়াও তারা যে বকুলনগর গলিতে ছিলেন, সেখানেও বাংলাদেশের অনেক নারী রয়েছেন। সেখানে বাংলাদেশের নারীদের অনেক চাহিদা থাকায় পাচারকারীরা তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়েছে বলে এই পাঁচজন জানান।

এই পাঁচজনের সাক্ষাৎকারে পাওয়া তথ্য এবং গত ১৫ বছরে রাইটস যশোর ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্ধারকৃতদের তালিকা থেকে বোঝা যায়, পাচারের শিকার যারা তাদের অধিকাংশই নারী। যে তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হচ্ছে।

## ঘাটে ঘাটে ব্যবসা

অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, মানবপাচার এবং চোরাচালানের জন্য এসব ঘাট বা স্পটের অদূরে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে যারা বাস করেন, তাদের ঘর বাড়িগুলোই পাচারকৃতদের প্রাথমিক আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা নিজেরা পাচারের সাথে জড়িত না থাকলেও দালাল সিন্ডিকেটের সাথে তাদের রয়েছে সখ্যতা। চোরাচালানকৃত মালামাল এসব বাড়িঘরে না রাখা হলেও পাচারের শিকার নারী ও শিশু এসব বাড়িতে আশ্রয় নেয়। 'বর্ডারের অবস্থা' বিবেচনায় তাদেরকে দু'চার ঘণ্টা থেকে দু'চারদিন পর্যন্ত এখানে থাকতে হয়। সেসময় মাথা প্রতি নির্ধারিত হারে ভাড়া দিতে হয় বাড়ির মালিককে। পাচারকৃতদের সাথে থাকা দালালরাই এই ভাড়া প্রদান করে। পাচারের শিকার একাধিক নারী ও বিভিন্ন ঘাট সংলগ্ন একাধিক দালাল এ তথ্য জানিয়েছেন।

তবে, সীমান্ত সংলগ্ন শার্শা এলাকার রুবেল, আবুল কালাম এবং চৌগাছা ও মহেশপুর সীমান্ত এলাকার মোস্তফা,পলাশ কুমার ও গফুরসহ দশজন বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, তারা কেউ মানব পাচারের সাথে জড়িত নন। তবে, কারা পাচার করে তাদেরকে তারা চেনেন। পাচারের শিকারদের কারো কাছে বা অপরিচিত লোকের কাছে ঘর ভাড়া দেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন তারা। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাদের বাড়িতে অপরিচিত লোকজন কেনো দেখা যায় জানতে চাইলে তারা বলেন, ওরা সবাই আত্মীয়-স্বজন! উল্টো ধমক দিয়ে বলেন, 'বর্ডার এলাকায় থাকি বলে কি আত্মীয়-স্বজন থাকতে নেই!'

## ৮২ ঘাটে অসংখ্য আবাস

যশোরসহ দেশের দক্ষিণ-পশিচমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী ৮২ ঘাট ঘেঁষা বসবাসকারী বাড়িগুলোতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য আবাস। প্রতিটি বাড়িই যেনো এক একটা হোটেল-মোটেল! টেকনাফ, বরিশাল, ঢাকা, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাচারের জন্য আনা নারী ও শিশুদেরকে এসব ঘরে রাখা হয়। কখনো দিনের দু'চার ঘণ্টা, কখনো এক-দুই রাত, আবার কখনোবা পাঁচ-ছয়দিন এসব ঘরে থাকতে হয়। সীমান্তের এপাশে কিংবা ওপাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ডিউটি কিংবা তৎপরতার উপর নির্ভর করে ওইসব আধাপাকা অথবা কাঁচা ঝুপড়ি ঘরে তাদের থাকার সময়সীমা বাড়া ও কমা। এসব ঘরে থাকতে প্রতিদিনের জন্য প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে ঘর মালিককে ভাড়া দিতে হয়। এ ঘর ভাড়া সাথে থাকা দালালরাই পরিশোধ করে। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থাও দালালরা করে। পাচারের শিকার ১০ জন নারীর সাথে কথা বলে এ তথ্য মিলেছে।

ভারত থেকে উদ্ধার এবং বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে আটক ভিকটিমদের অধিকাংশ নারী প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে কাজ করা সংস্থা রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক বলেন, "বিশ্বের অন্যান্য দেশে মানব পাচারের শিকার অধিকাংশ পুরুষ হলেও ভারতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এখানে শতকরা ৯৯ ভাগই নারী।"

মানব পাচার প্রসঙ্গে যশোর ৪৯ বিজিবির কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, বেনাপোল থেকে মহেশপুরের যাদবপুর পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার সীমান্তের পাহারায় তারা। তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে এখানে পাচারের ঘটনায় আটক এবং উদ্ধার অনেক বেশি।

## যে ৮২ ঘাট দিয়ে হচ্ছে মানব পাচার

ব্যাপক অনুসন্ধানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল সীমান্ত এলাকায় যেসব ঘাটের সন্ধান মিলেছে সেগুলো হচ্ছে, যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর, শিকারপুর, জেলেপাড়া, ধান্যখোলা, সাদীপুর, লক্ষণপুর, শিববাস, শালকোনা, বেনাপোল, আঁচড়া, পাঁচভুলট, গোগা, অগ্রভুলট, ভুলট, রুদ্রপুর, পুটখালী, বাহাদুরপুর, ঘিবা, পাটবাড়ি, খলশী, গাতিপাড়া, দৌলতপুর ও দশপাখিয়া। ঝিকারগাছা উপজেলার ছুটিপুর।

চৌগাছা উপজেলায় রয়েছে আন্দুলিয়া, আশিংড়ি, পুকুরিয়া, নায়ড়া, গয়ড়া, গদাধরপুর, তিলেতপুর, কুলিয়া, বর্ণী, হিজলি, মাশলে, বড় কাবিলপুর, ছোট কাবিলপুর, সাহাজাদপুর, দশপাখিয়া।

ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা মহেশপুরে রয়েছে অসংখ্য ঘাট। যে ঘাটগুলো এসময়ে মানব পাচারকারীদের কাছে বেশ 'পছন্দের ঘাট' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এখানকার একটি ঘাট দিয়েই অতিসম্প্রতি সাবেক প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ আত্মগোপনে ভারতে যাওয়ার সময় আটক হন।

মহেশপুরের ঘাটগুলো হচ্ছে, যাদবপুর, লেবুতলা, জলুলি ক্যাম্পের পাশে মাশিলা, কানাইডাঙ্গা, বেতবাড়িয়া, গোপালপুর, জলুলি, সুন্দরপুর, মকধাসপুর, কানাইডাঙ্গা, সামন্তা, হলিয়ানপুর, বাঘাডাঙ্গা, খোশালপুর, শ্যামপুর, লড়াইঘাট, শ্রীনাথপুর, কুসুমপুর ও হিজলী।

সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তবর্তী ঘাটগুলোর মধ্যে রয়েছে, তলুইগাছা, চন্দনপুর, ভোমরা, লক্ষ্মীডারি, হড়দ্দাহ, কুশখালী, চান্দুরিয়া, কাকডাঙ্গা, ক্যাড়াগাছি, মাদ্রা, হিজলদি, সুলতানপুর। কুষ্টিয়া জেলায় দৌলতপুর, মহিষকুন্ডি।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর, বেনীপুর, নতুনপাড়া, পোতাখালী, গয়েশপুর, রাজাপুর ও দামুড়হুদার মুনশিপুর।

পর্ব: ০২

# ভারত গ্রাম, যেখানে পাচারের শিকার নারীদের বসবাস

বাংলাদেশের মানচিত্রে নেই নামটি, কিন্তু যশোরের ছোট্ট এক টুকরো গ্রামকে স্থানীয়রা চেনে 'ভারত গ্রাম' নামে। যুগ যুগ ধরে এই নাম মুখে মুখে ফেরে। যশোরের শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়নে এই গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার আয়তনের মাখলার বিল। বিলটি মিশেছে ইছামতি নদীতে। বর্ষাকালে নদী উপচানো পানি বিলে ঢোকে, বিল ছাপিয়ে পানি ভাসায় গ্রামটিকে। ইছামতি নদীই ভারতের সাথে বাংলাদেশের এই গ্রামের সীমান্ত ভাগ করে দিয়েছে। দেশের এমন হাজারো গ্রাম আছে ভারতের সাথে সীমান্ত ঘেঁষা। কিন্তু যশোরের এই গ্রামটিই একমাত্র যার নিজের নাম থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এমনকি দেশের আরও দূরের মানুষেরা গ্রামটিকে চেনে 'ভারত গ্রাম' নামে।

দেশের মানচিত্রে প্রায় সাত বর্গ কিলোমিটারের এই গ্রামের নাম বসতপুর। আট হাজারের

- ইছামতি নদী ভারতে পাচারের অন্যতম পথ
- গ্রামের পার্শ্ববর্তী ১৩ কিলোমিটারে তিনটি সীমান্ত

বেশি মানুষের বাস এই গ্রামে। আছে দু'টি কলোনিপাড়া। গ্রামটির পূর্বদিকে সাত কিলোমিটার গেলে মূল বড়বাজার ও যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়ক। এখানেই ইউনিয়ন পরিষদ। গাছগাছালিতে ভরপুর এ বসতপুরের পশ্চিম ও পশ্চিম উত্তরকোণে ভারতের তিনটি সীমান্ত এলাকা। সবচেয়ে কাছের, সাত কিলোমিটার দূরে গোগা সীমান্ত। এরপর নয় কিলোমিটার দূরে ভুলট এবং ১৩ কিলোমিটার দূরে পুটখালী সীমান্ত।

গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা সাধারণ চোখে অন্যসব সীমান্তবর্তী গ্রামের মতোই। কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে যুগ যুগ ধরে এই গ্রামের মানুষ পাচারের শিকার হয়ে আসছে। আর পাচার হওয়া গ্রামবাসীর প্রথম গন্তব্য ভারত। কেউ অজান্তে, আবার কেউ বা প্রতারণার শিকার হয়ে পাচার হয়। নারী, পুরুষ, শিশু কেউ বাদ যায় না এই পাচারকারী চক্রের হাত থেকে। তবে, পাচারকারীদের মূল লক্ষ্য নারী। দীর্ঘদিন ধরে এই পাচার বাণিজ্য গ্রামটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অংশ। আর যেহেতু পাচারের গন্তব্য ভারত তাই মানুষের মুখে মুখে এই গ্রামের নাম কত যুগ আগে পাল্টে 'ভারত গ্রাম' হয়েছে সেই ইতিহাস বর্তমানের গ্রামবাসীর কারও জানা নেই।

গ্রামটির উত্তর পাশ দিয়ে একটি সড়ক গেছে ভারত সীমান্তের দিকে। গোগা নামে এই সড়কটিই মানব পাচারকারীদের প্রধান রুট। মানব পাচার বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে আছে মাদকসহ আরও অনেক ধরনের জিনিস পাচারের সম্পর্ক, জানান গ্রামটির ইউপি মেম্বার আব্দুল মালেক।

বসতপুর গ্রামের চল্লিশোর্ধ্ব এক নারী বলেন, এ গ্রামের বেশিরভাগ নারী ভারতে যাতায়াত করে। সেখানে তারা কাজ করে এবং মাঝে মাঝে গ্রামে এসে পরিবারকে টাকা দিয়ে যায়। গত ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে এ অবস্থা বিরাজ করছে। এ কারণে গ্রামে দু'টি ভারত কলোনি গড়ে উঠেছে, যা সবার কাছে পরিচিত।

এসব বিষয়ে কথা হয় স্থানীয় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আব্দুল মালেকের সাথে। তিনি বলেন, বসতপুর গ্রামটি অনেকের কাছে 'ভারত গ্রাম' নামে পরিচিত। এখানকার অনেক মেয়ে দালালের মাধ্যমে সীমান্তের চোরাপথে ভারতে গিয়ে বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে । তারা গ্রামে যাতায়াতও করে। এ কারণে বসতপুর 'ভারত গ্রাম' হিসেবে নতুন পরিচিতি পেয়েছে। তবে, এখন মেয়েদের ভারত যাওয়ার প্রবণতা একটু কমেছে। সীমান্তের ভারতীয় অংশে কাঁটাতারের বেড়াসহ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। তারপরও যাতায়াত থেমে নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ বিষয়ে বাগআঁচড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল খালেকের সাথে কয়েক দফা যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়ায় গত ৫ আগস্টের পর থেকে আর ইউনিয়ন পরিষদে যাননি এবং কারো মোবাইল ফোনও রিসিভ করছেন না। তিনি বর্তমানে যশোর শহরে বসবাস করেন বলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে।

বসতপুর গ্রামের মেয়ে জেমিনি (ছদ্মনাম)। একসময় পাচারের শিকার হয়ে পরে ফিরতে পেরেছে নিজের জন্মস্থানে। কিন্তু তার স্বাভাবিক জীবন তছনছ হয়ে গেছে। থাকেন যশোরে একটি 'শেল্টার হোমে।' পাচার হওয়ার পরের জীবনটি ছিল ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের। এক সময় সেই বেদনা আর কান্নার জীবনই সহনীয় হয়ে উঠেছিল। তখন ভারত থেকে রাতের আঁধারে গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে গ্রামে এসে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে ফিরে গেছেন পাচার হওয়া জীবনে। বহু বছর ভারতের কলকাতার এক অন্ধকার জগতে ছিল তার বাস। অনাকাঙ্ক্ষিত এই জীবনের এক পর্যায়ে ধরা পড়ে যান, তারপর উদ্ধারকারীদের মাধ্যমে যশোরের একটি বেসরকারি শেল্টার হোমে তার ঠাঁই হয়।

এই প্রতিবেদকদের কথা হয় জেমিনির সাথে। জানান, ২০০৯ সালে তার বয়স ছিল ১৪, নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। বসতপুর গ্রামের দু'নম্বর কলোনিপাড়ায় পরিবারের সাথে থাকতেন। ধনী পরিবারে বিয়ে করার সাধ লালন করতেন, যেন উন্নত জীবন হয়। তা না হলে কাজ করে গ্রামের দরিদ্র জীবন পাল্টানোরও চিন্তা ছিল। জীবনের সেরকম ভাবনার একপর্যায়ে জেমিনির সাথে যোগাযোগ হয় দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের। সেটাই তার জীবনের মোড় ঘুরায়; তবে, স্বপ্নের পথে নয়, কল্পনাতীত দুঃস্বপ্নের গন্তব্যে।

জেমিনি তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে ভারতের কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব পান। সেখানে বিউটি পার্লারে কাজ মিলবে বলে জানানো হয় তাকে। সিনেমার অনেক নায়িকারা সেই পার্লারে যায়। ভালো কাজ ও সম্পর্ক গড়তে পারলে ভারতের চলচ্চিত্রেও অভিনয় করার সুযোগ মিলতে পারে! যেন মনের গভীরে অজান্তে লালন করা স্বপ্ন উড়ে এসে ধরা দেয় জেমিনির কাছে। তাই তার মোহ আবিষ্ট মন যৌক্তিক চিন্তার জগতকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। মোহের টানে জেমিনি রাজি হয়ে যান। ভারতের কলকাতায় যাবেন, নায়িকা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হন। সে বছর সেপ্টেম্বরের এক রাতে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে আত্মীয়রূপী

দালালের সাথে বাড়ি থেকে সাত কিলোমিটার দূরের গোগা সীমান্তে যান। সেখানে আরও চার-পাঁচজন অপেক্ষমাণ মেয়ের দেখা পান। সেখান থেকে নৌকায় ইছামতি নদী পার হন তারা। নদীর ভারত পাড়ে নেমে একটি বাগানের পথ ধরে হেঁটে একটি ঘরে পৌঁছান। সেখানে একদিন থাকেন। আত্মীয়রূপী পুরুষ দালাল পরেরদিন ফিরে যান। যাওয়ার আগে অভয় দিয়ে যান-সেখানের সবাই তার পূর্বপরিচিত, কোনো সমস্যা নেই। ভালো একটি বিউটি পার্লারে জেমিনির কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেই ঘর থেকে পরের বিকেলে জেমিনিকে বাসে করে কলকাতায় নেয় ওপারের দালালেরা। প্রায় দু'ঘণ্টা বাস চলার পর সন্ধ্যা সাতটার দিকে একটি বাজারের কাছে নামেন। বাজারের ভেতরের গলি রাস্তা দিয়ে হাটতে থাকেন, দু'পাশে আরও মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল। সেই পরিবেশ প্রথম স্বপ্নে বিভোর জেমিনির মনে ভয়ের অনুভূতি তৈরি করে। হাঁটতে হাঁটতেই সঙ্গী এক ভারতীয়কে বলেন, আর যাবেন না, বাড়ি ফিরে যাবেন। ততক্ষণে বড্ড বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। যে পথে ঢুকে পড়েছিলেন জেমিনি সে পথ থেকে ফেরার সামর্থ্য তার ছিল না।

সঙ্গী ভারতীয় ব্যক্তি জেমিনির হাত শক্ত করে ধরে টানতে টানতে আরও ভেতরে নিয়ে যায়। এক জায়গায় গিয়ে মাঝ বয়সী এক মহিলার হাতে তুলে দেয় জেমিনিকে। সেখান থেকে আরও দু'জন তাকে জোর খাটিয়ে একটি ঘরে নিয়ে আটকে রাখে। সেই রাতেই জেমিনির জীবনের সব সুন্দর স্বপ্নেরই শুধু মৃত্যু ঘটেনি, একজন নারী হিসেবে জেমিনি তার জীবনের শারীরিক ও মানসিক ইচ্ছার সকল স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেন। অন্যের ইচ্ছার ক্রীতদাসে পরিণত হয় তার জীবন, যা বিভীষিকাময় নির্যাতনের।

জেমিনি বলেন, এভাবে একমাস আটকে রেখে তার দেহ বিক্রি করতো দালালরা। এমনও হয়েছে, একদিনে ১৫ থেকে ২০ জন পুরুষকে পাঠানো হয়েছে জেমিনির কাছে। একপর্যায়ে জেমিনি জানতে পারেন, কলকাতার একটি যৌন পল্লীতে তাকে বিক্রি করা হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত সেই জীবনকে এক সময় মেনে নেন জেমিনি, প্রতিমাসে ভালো টাকা আয়ও করেন।

সেই অন্ধকার জীবনের একপর্যায়ে সেখানে তার সাথে পরিচয় হয় বাংলাদেশি এক যুবকের। তার সহযোগিতায় তিনি এক বছর পর গোগা সীমান্তের ওই চোরাপথ দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে হতাশ হন। পরিবারের লোকজন তাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। পাড়া প্রতিবেশীর বাঁকা কথা, হাসাহাসি, তাচ্ছিল্য ও পরিবারের অনীহায় মন খারাপ করে তিনি ফের ভারতে ফিরে যান। ওই পল্লীই তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে। গত ১৫ বছরে জেমিনি সাত থেকে আটবার সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারত গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। রাতের আঁধারে বাবা-মায়ের সাথে দেখা করে সময় কাটিয়ে দু'চার দিন পর আবারো ফিরে গেছেন ভারতে । অবশ্য এসব যাতায়াতে সীমান্ত পার হওয়ার জন্য তাকে দালালদের হাতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে।

সর্বশেষ, জেমিনি চলতি বছরের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বাড়ি এসে ভারতে ফেরার পথে গোগা সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিজিবির হাতে ধরা পড়েন। এ দলে তার সাথে আরও পাঁচজন ছিল। বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে আটক করার পর আদালতের মাধ্যমে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শেল্টার হোমে পাঠায়।

যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামের এ শেল্টার হোমে গিয়ে জানা যায়, গত দু'মাস

তিনি বসবাস করছেন। বিষয়টি তিনি পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছেন, কিন্তু এখনও কেউ তার সাথে দেখা করেননি। এ শেল্টার হোমে তার সাথে কথা হলে তিনি পাচারের কাহিনি জানান। এখানে তিনি কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করেন, তার নাম-পরিচয় যেন প্রকাশ করা না হয়। তিনি বলেন, তার জীবন ও স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না। মা-বাবাসহ সবাই থাকতেও এখন তার কেউ নেই। চারদিকে শুধুই হতাশা। তার অনেক টাকা থাকলেও এমন জীবন মানুষের হতে পারে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার জীবন শেষ করে দিয়েছে বলে তিনি আফসোস করেন।

তিনি বলেন, বসতপুর ভারত গ্রামে কলোনি-১ এবং কলোনি-২ এ প্রায় প্রতিটি পরিবারের নারী-পুরুষ ও শিশু ভারতে পাচারের শিকার হয়ে বসবাস করে। সেখানে কেউ গৃহপরিচারিকা, কেউ বিউটি পার্লারে আবার কেউ যৌনকর্মীর পেশায় যুক্ত হয়েছেন। তারা মাঝে মাঝেই গ্রামে ফিরে আসে এবং পরিবারকে টাকা দিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে ফিরে যান। আবার কেউ কেউ গ্রামের নারীদের বেশি টাকা আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যৌনপল্লীতে নিয়ে বিক্রি করছে। ওই গ্রামের কয়েকজন নারী ও পুরুষ এ পাচার কাজের সাথে জড়িত। যারা গ্রামবাসীর মধ্যে পাচারকারী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কেউ তাদেরকে এ কাজে বাধা দেয় না।

পাচারের শিকার ওই গ্রামের কলোনি-২ এর ৩২ বছর বয়সী অপর এক নারী জুবুলি (ছদ্মনাম) বলেন, গত ২০১৪ সালে তিনি ভারতে পাচারের শিকার হন। ভালো কাজের প্রলোভনে পড়ে গ্রামের এক নারীর সাথে তিনি কলকাতায় যান। সেখানে নিয়ে তাকে একটি আবাসিক হোটেলে কাজ করার চাকরি দেয়া হয়। এরপর থেকে শুরু হয় তার ওপর নির্যাতন। সেখানে তাকে যৌনকর্মীর পেশায় যুক্ত করা হয়। বছরখানেক পর এক বাংলাদেশির মাধ্যমে দেশে ফিরে আসার পর আর যাননি। যদিও কয়েক দফা দালালরা তার কাছে এসে বিনা খরচে ভারতে পাঠানো ও ভালো কাজ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি তাদের প্রস্তাবে আর রাজি হননি।

পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন। যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামে তারা শেল্টার হোম গড়ে তুলেছে। এখানে তারা পাচারের শিকার ও উদ্ধার হওয়া নারী-শিশুদের আশ্রয় দিয়ে থাকেন। তবে, সেটা আইনগত প্রক্রিয়ায় ও থানা পুলিশ, আদালতের মাধ্যমে।

এদিকে, যুগের পর যুগ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্ত পথে চলছে মানবপাচার। এসব পাচারকারী সিন্ডিকেটের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সখ্যতা রয়েছে। তারা জানে কারা পাচারের সাথে জড়িত ও কীভাবে কোন কৌশলে পাচার করা হচ্ছে। অথচ অবৈধ এ কর্মকাণ্ড বন্ধে নেই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ। উপরন্তু তাদের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেনের কারণে পরোক্ষ সহযোগিতায় পাচার বন্ধ হচ্ছে না। এ কারণে শার্শার বসতপুর গ্রাম তার নাম হারিয়ে স্থানীয়দের কাছে 'ভারত গ্রাম' নামে নতুন পরিচিতি পেয়েছে। গ্রামবাসীও বিষয়টি মেনে নিয়েছে, অবৈধ এ কারবার প্রতিরোধে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। জনপ্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছেন।

যদিও বিজিবির অভিযানে প্রতি মাসেই বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ সীমান্ত থেকে আটক হচ্ছে। আবার ভারতের যৌনপল্লী এবং অবৈধ অভিবাসী হিসেবে আটক হওয়ার পর আইনি

প্রক্রিয়া শেষে বিএসএফ, বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে। এর বাইরেও গত ১০ বছরে আরও ১৫ হাজার নারী-পুরুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে বলে পাচার নিয়ে কাজ করা দু'টি উন্নয়ন সংস্থা রাইটস যশোর ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে যশোর ৪৯ বিজিবির অপারেশন অফিসার মাসুদ রানা বলেন, ৪৯ বিজিবি যশোরের শার্শা উপজেলা থেকে ঝিনাইদহের মহেশপুরের যাদবপুর পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার সীমান্তে দায়িত্ব পালন করে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য সীমান্তে বিজিবির ১৪টি বিওপি ক্যাম্প রয়েছে। বিজিবির কঠোর অভিযানে সীমান্ত এলাকায় এখন মানব পাচার ও মাদক পাচার প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। আগামীতে এ জাতীয় অবৈধ কর্মকাণ্ড শূন্যতে নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

পর্ব: ০৩

# দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তে পরতে পরতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, তবুও থামছেনা মানবপাচার

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত এলাকার যশোর থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার হয়ে উঠেছে মানবপাচারের চিহ্নিত রুট। এই রুটের বিভিন্ন ঘাট দিয়ে যারা পাচার হচ্ছেন, তাদের সিংহভাগই নারী ও শিশু। এসব শিশুর মধ্যে শুধু মায়ের কোলের শিশু সন্তান নয়, মেয়ে শিশু ও বালিকাও রয়েছে বিশাল সংখ্যক। ব্যাপক অনুসন্ধানে এ তথ্য মিলেছে।

তথ্য অনুযায়ী, গত ১০ বছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন ঘাট দিয়ে পাচারের মধ্যে উদ্ধারের সংখ্যা এক হাজার ৬৩৬ জন। এদের মধ্যে এক হাজার ১০০ নারী ও বালিকা ২৩৬ জন। এতে উদ্ধারকৃত নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭.২৩%। আর বালিকা ১৪.৪৩%। সব মিলিয়ে ৮১.৬৬%।

তবে, মানবপাচার প্রতিরোধে কাজ করা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কর্মীরা বলছেন, শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্ধার আর পাচারের সময় আটকদের সংখ্যা দেখেই সন্তোষ প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। ধারণা করা হয়, এ সংখ্যার অন্তত ১০ গুণ বেশি পাচারের শিকার হয়েছেন। সে হিসেবে, গত ১০ বছরে যশোরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত পথে পাচারের শিকার হয়েছেন ১৬ হাজারেরও বেশী।

বিজিবি বলছে,সীমান্তে চোরাচালান এবং মানবপাচার প্রতিরোধে তারা নিরলসভাবে কাজ করছে। তার মধ্যেই দালাল চক্র গোপন কার্যক্রম চালায়। সারাদেশে এই চক্র বিশাল নেটওয়ার্ক গড়েছে। যার ফলে, টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এক নারী সদস্য গত ২১ অক্টোবর পাচারের সময় আটক হয়েছেন চৌগাছা সীমান্তের মাশিলা ঘাট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পাচারের সময়। তিনি উখিয়া ক্যাম্পের রোহিঙ্গা নারী। এ থেকে প্রমাণিত হয় দেশের

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতে মানবপাচারের বিশাল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাচারের শিকার যারা হচ্ছেন, তাদের নিজের বাড়ি থেকে ভারতের নির্ধারিত কর্মস্থল পর্যন্ত প্রতিটি বাস স্টপেজে হাত বদল হতে হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মানবাধিকার সংগঠন রাইটস যশোর বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ২০১৪ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে ৩৩৬ জন নারী, ১৭১ জন পুরুষ, ১৪৪ জন বালিকা ও ১০৪ জন বালক, চলতি বছরের সাত মাসে নারী ১৩, বালিকা ১৬ ও বালক সাতজনকে উদ্ধার করেছে। এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রাইটস যশোর ভারত থেকে উদ্ধার করেছে নারী ৫৩ জন, পুরুষ আটজন, বালিকা ৫৬ জন ও বালক ১০ জনকে। তাদের সবাইকে স্ব স্ব পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা ছাড়াও পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে রাইটস যশোর জানিয়েছে।

এছাড়া, এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পাচারের শিকার ৪০৮জন নারী পুনর্বাসনের অপেক্ষায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যশোর আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন। তাদের সাথে রয়েছে বিভিন্ন বয়সী ২০ জন শিশু। এ আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে আরও ১১৭ জন নারীকে। যারা সম্প্রতি ভারতে পাচারকালে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন ঘাটে বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক হয়। এছাড়াও শার্শার বাগআঁচড়া ইউনিয়নের বসতপুর গ্রামে ২৭০ জন পাচারের শিকার নারী রয়েছেন।

সব মিলিয়ে পাচারের শিকার বিশাল অঙ্কের মানুষের সংখ্যা কম নয়। যাদের মধ্যে নারী ও মেয়ে শিশুর সংখ্যা ৮১.৬৬%।

## ঘাটে ঘাটে ধর্ষণ

অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় সীমান্তবর্তী ঘরে থাকাকালীন অনেক নারীই ধর্ষণের শিকার হন। ভারতে একাধিকবার অবৈধভাবে যাতায়াতকারী পাঁচ নারীর সাথে কথা বলে এ তথ্য মিলেছে। তবে, তাদের কেউ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে স্বীকার করেননি। তারা অপর নারীকে ধর্ষণের শিকার হতে দেখেছেন বলে জানান।

এসব নারী বলেন, তাদের মতো ভারতে যেতে চাওয়া নারীদের মধ্যে যাকে বা যাদেরকে ধর্ষণ করে,তাদেরকে ঘরের ভেতরে রেখে অন্যদেরকে বাইরে বের করে দেয়া হয়। থাকতে দেয় গরু রাখার গোয়াল ঘরে কিংবা রান্না ঘরে। কখনো সাথে থাকা দালাল, কখনোবা ওই ঘরের মালিক, আবার কোনো কোনো সময় স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কেউ কেউ এই ধর্ষণের কাণ্ড ঘটায়।

## ভারতে যাওয়ার খরচ কতো?

সাধারণত অনেকেরই ধারণা, কাউকে ভারতে পাচার করলে তাকে বা তার পরিবারকে টাকা-পয়সা দেয়া হয়। কিন্তু ভারতে পাচারের শিকার নারীদের সাথে কথা বলে এ ধারণার সত্যতা মেলেনি। তথ্য মিলেছে, কেউ উচ্চাভিলাষ পূরণে কিংবা সংসারে সচ্ছলতা আনতে যদি দালালের মাধ্যমে ভারতে যেতে চায়, তবে তাকে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা দিতে হয়। যারা এই টাকা দিতে পারে না, পরে ওই টাকা কাজ করে পরিশোধ করবে মর্মে দালালের সাথে চুক্তি করে। এই টাকার ১০ হাজার পর্যন্ত বাংলাদেশের দালাল যাতায়াত, পথে খাওয়া খরচ এবং সীমান্তে ঘর ভাড়া ব্যয় বাবদ দেখায়, বাকিটা নিজে লাভ হিসেবে

রাখে। বাকি ১০ হাজার পাচারকৃতকে হস্তান্তর করার সময় ভারতীয় দালালকে দিয়ে দেয়। যদি সীমান্ত থেকে ভিকটিমের বাড়ির দূরত্ব বেশি হয় তখন ২০ হাজারের রেট বেড়ে ২৫ হাজার পর্যন্ত ওঠে। শার্শা, চৌগাছা এবং মহেশপুরের একাধিক দালালের সাথে কথা বললে এই রেট বাড়া-কমার বিষয়টি জানা গেছে।

## ৪৪৪ কিলোমিটার সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের শিকার কতো?

মালয়েশিয়া, সৌদী আরব, দুবাই, লিবিয়া, কাতার, লেবাননসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে যারা পাচার হচ্ছেন, তার সংখ্যা বা কম বেশি পরিসংখ্যান সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার হাতে থাকে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গত দশ বছরে কতো মানুষ পাচার হয়েছেন, তা কেউই বলতে পারে না। সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে পাচার প্রতিরোধে কাজ করা সংস্থাগুলোর কাছে পাচারকৃতদের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। সবাই এ বিষয়ে ধারণা থেকেই কথা বলেন। এমন তথ্য মিলেছে একাধিক মানবাধিকার কর্মীর সাথে কথা বলে।

বিষয়টি নিয়ে কথা হয় রাইটস যশোরের তথ্য অনুসন্ধান কর্মকর্তা তৌফিকুজ্জামানের সাথে। তিনি বলেন,'অনেকে আছেন, কোনো নির্দিষ্ট তথ্য ছাড়াই সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে হাজার হাজার মানুষ পাচার হচ্ছে' বলে বক্তৃতা করেন। কিন্তু গত দশ বছরে ভারতে অবৈধভাবে কতো মানুষ পাচার হয়েছেন, তার কোনো সঠিক তথ্য কারো কাছে নেই। কেউ দিতে পারবেও না। যারা এ বিষয়ে কোনো অঙ্ক বা ফিগার বলেন, তারা তাদের ধারণা থেকেই বলেন।'

তিনি বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন মানবপাচার প্রতিরোধে যে কাজ করেছি, ভিকটিম উদ্ধার ও তাদের পুনর্বাসনে যতটুকু ভূমিকা রেখেছি, তা থেকে এটুকু ধারণা করতে পারি, আমরা যে সংখ্যক উদ্ধার করেছি, তার দশ গুণেরও বেশি সংখ্যক মানুষ পাচারের শিকার হয়েছেন।

পর্ব: ০৪

# সব হারিয়ে নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টায় অনেক নারী

পাচারের শিকার কদবানু (ছদ্মনাম) নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি এখন টেইলারিংয়ের ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। যা দেখে গ্রামের অন্য নারীরাও অনুপ্রাণিত। শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের স্মৃতি আড়াল করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। যশোরের শার্শা উপজেলার বসতপুর গ্রামে এই স্বপ্নজয়ী নারীর বসবাস।

কদবানুকে নতুন করে জীবন গড়ার পথ দেখিয়েছে বসতপুর মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা। এ সংস্থার মাধ্যমে তার মতো একই গ্রামের আরও ১৭০ জন নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং নিজে আয় করে সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন।

কদবানু বলেন,শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়নের গোগা সীমান্তবর্তী মাখলার বিলপাড়ের গ্রাম বসতপুর। গত ১৫ বছরে এ গ্রামের অনেক মেয়ে ভারতে পাচারের শিকার হয়েছেন। তাদেরকে ভালো কাজের প্রলোভন দিয়ে দালালরা ভারতে নিয়ে গেছে। এরপর পরিস্থিতির শিকার হয়ে কেউ কেউ আর বাড়ি ফিরে আসেননি, ভারতেই বসবাস করছেন। সেখানে কেউ গৃহপরিচারিকা, কেউ যৌনকর্মী, আবার কেউ বিউটি পার্লার বা হোটেলে কাজ করেন। তবে, মাঝে মাঝেই পাচারের শিকার অনেক মেয়ে সীমান্তের চোরাপথ দিয়ে ভারত থেকে বসতপুর গ্রামে ফিরে আসেন এবং জানান, কলকাতায় তারা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ভালো আয় করছেন। গ্রামে তাদের পরিবারের সদস্যরাও অনেক ভালো আছেন ও পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। ভারতে যাওয়া ওইসব নারীর উপার্জনের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০১০ সাল নাগাদ কদবানু ভারতে যাওয়ার চিন্তা শুরু করেন। ওইসময় তাদের সংসার চলছিল অনেক কষ্টে। ভ্যান চালক স্বামী সারাদিন খেটে যে উপার্জন করতেন, তা থেকে এক ছেলেকে নিয়ে তাদের সংসার চলছিল না। এছাড়া, তাদের বাড়তি আয়ের আর কোনো পথও নেই। তাদের ছিল না কোনো চাষাবাদের জমি। শুধুমাত্র বসবাসের জন্য সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি রয়েছে। সেখানে তারা টিনের চালা ঘরে বসবাস করেন।

কদবানুর সাথে আলাপকালে জানা যায়, ২০১০ সালের জুন মাস নাগাদ তার স্বামী পেটের ব্যাথায় এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, কোনো কাজ করতে পারতেন না। বাড়িতে শুয়ে থেকে দিন পার করতেন। তাকে কয়েকবার স্থানীয় নাভারণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার দেখান। একপর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তাররা জানান, তার লিভারে সমস্যা ভালো হতে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসা নিতে হবে। অনেক টাকা ব্যয় হবে। সেই টাকা তাদের ছিল না। এ সময় তাদের তিনবেলা খাবার খাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। সেই সংকটের একপর্যায়ে কদবানুর সাথে তাদের গ্রামের ভারতে পাঠানো দালাল আকতারের যোগাযোগ হয়। কদবানুকে ভারতে নয়, দুবাইয়ে পাঠানোর প্রলোভন দেয় আকতার। সেখানে শেখের বাড়িতে কাজ দিয়ে পাঠাবেন। রোজগার হবে ভালো, কোনো ঝুঁকি থাকবে না বলে জানান। তবে,দুবাইয়ে কাজে যেতে টাকা লাগবে বেশি। এই প্রলোভনে পড়েন কদবানু। বাবার বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব টাকা নেন, বাকিটা ধার করে তিন লাখ টাকা দালালকে দেন। কদবানু উড়ে যান দুবাইয়ে।

তিনি বলেন, ২০১০ সালের আগস্ট মাসের সকালে (তারিখ মনে নেই) তাকে বাড়ি থেকে শার্শার বাগআঁচড়া বাজারে নেয়া হয়। সেখান থেকে পরিবহনযোগে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায়। এরপর ওইদিন গভীর রাতে বিমানের একটি ফ্লাইটে তাকে উঠিয়ে দেয়া হয়। পরেরদিন ভোরে

তিনি দুবাই এয়ারপোর্টে নামার পর একজন মহিলা তাকে গ্রহণ করেন। পরে গাড়িতে করে ওই দেশের একটি অফিসে নিয়ে তাকে রাখা হয়। সেই অফিসটি পরিচালনা করতেন একজন ইন্দোনেশিয়ান নারী। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন ট্যুরিস্ট ভিসায় ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে তাকে দুবাইয়ে পাঠানো হয়েছে। তার কাজ করার মতো কোনো কাগজপত্র নেই। তার সাথে আরও সাত-আটজন ছিলেন। অফিসটিতে ছেলে মেয়েদের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে দু'দিন থাকার পর দুবাইয়ের একজন শেখ এসে গোপনে তাকে গাড়িতে করে নিয়ে গৃহপরিচারিকার কাজ দেন। ওই বাড়ির কর্তা ব্যবসা করতেন ও তার স্ত্রী চাকরি করতেন। তাদের দু'টি ছেলে ছিল। বাড়িতে মাঝে মাঝেই তাদের আত্মীয় স্বজনরা আসতেন। সেখানে কাজের চাপ অনেক বেশি ছিল।

তিনি বলেন, কাজে যোগদানের চার-পাঁচদিন পর থেকেই তার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। মালিকের স্ত্রী প্রতিদিন সকালে অফিসে চলে যেতেন ও ছেলেরা ঘুমিয়ে থাকায় ওই কর্তা তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে নির্যাতন শুরু করেন। এর কিছুদিন পর বড় ছেলেটিও তার ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। এভাবে দুবাইয়ে তার তিন মাস কেটে যায়। একপর্যায়ে তিনি কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে নিজ এলাকার ওই দালালের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে বাড়ি ফিরে আসার জন্য কান্নাকাটি করেন। এসময় দালাল আকতার তাকে ইন্দোনেশিয়ার ওই নারীর ফোন নম্বর দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার কথা বলেন। কদবানু ওই নারীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বাড়ি ফিরতে হলে তাকে বিমান ভাড়া বাবদ ৬০ হাজার টাকা দিতে হবে। তা না হলে তিনি ফিরতে পারবেন না। এরপর কদবানু বাড়িতে স্বামীর সাথে যোগাযোগ করে ৬০ হাজার টাকা দুবাইতে ওই নারীর অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এরপর ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ তাকে দুবাইয়ের ওই শেখের বাড়ি থেকে ইন্দোনেশিয়ান নারীর অফিসে আনা হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর তাকে বাংলাদেশের বিমানে উঠিয়ে দেয় তারা। দুবাইতে তিনমাস কটানোর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। ওইসময় তিনি কাজ করে অল্প কিছু টাকা বাড়িতে পাঠাতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে অর্ধেক টাকা স্বামীর চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হয় এবং বাকি টাকা তার দেশে ফিরে আসার জন্য খরচ হয়ে যায়।

কদবানু বলেন, বিদেশ থেকে আসার পর বাড়িতে বসেই তার সময় কাটছিল। স্বামী ভ্যান চালিয়েই সংসার চালাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে ২০১২ সালে তিনি জানতে পারেন গ্রামে বসতপুর মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা বিদেশ ফেরত নারীদের বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তিনি সেখানে যোগাযোগ করে ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে টেইলারিং প্রশিক্ষণে ভর্তি হন। সেখানে পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন পুরোদস্তর টেইলর মাস্টার হয়ে উঠেছেন। গ্রামের নারী, শিশু ও কিশোরীদের পোশাক বানিয়ে মজুরির টাকায় তিনি এখন স্বাবলম্বী। এ কাজের মাধ্যমে তিনি টেইলর মাস্টার হিসেবে গ্রামে পরিচিতি পেয়েছেন। তার আয়ের মাধ্যমে সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। স্বামীর টাকার অপেক্ষায় না থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই কেনাকাটা করতে পারছেন। ভালোভাবে চালাতে পারছেন ছেলেদের পড়ালেখাও।

তিনি বলেন, তার মতো আরও কয়েকজন নারী ওই সংস্থায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ শিখে নিজেরাই উপার্জন করে সংসার চালাচ্ছেন। কলোনিপাড়ার জয়গুন, নাহার, বেগম, নুরুবিবির (সবার ছদ্মনাম) সাথে কথা বলে জানা যায়, তারাও দালালদের প্রলোভনে পড়ে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ভারতে পাচারের শিকার হয়েছেন। তাদেরকে সীমান্ত পার করার পর সরাসরি

নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। এখানে তাদের দু'জনকে বিক্রি করা হয় যৌনপল্লীতে, একজনকে পাঠানো হয় আবাসিক হোটেলে ও একজনের বয়স ৪০ হওয়ায় তাকে গৃহকর্মীর কাজ দেয়া হয়। তারা বলেন, সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার পর তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। ওই দেশের প্রভাবশালীদের কাছে হস্তান্তর হওয়ার পর তাদের ওপর শুরু হয় নির্যাতন ও তাদের কথামতোই চলাফেরা করতে হয়। তারা যেখানে নিয়ে যায়, তাদের সেখানেই যেতে হয়। বাইরের কারো সাথে তাদের কথা বলতে দেয়া হয় না। এক প্রকার বন্দি জীবনযাপন করতে হয়। এ কারণে সব পরিস্থিতি তাদের মেনে নিতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতে নানা খারাপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে টিকে থাকতে হয় তাদের । সেখানে বছর খানিক কাটানোর পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তারা বাড়িতে যোগাযোগ ও দেশে যাতায়াতের ছুটি পায়। এসময় অনেকে বাড়িতে এসে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে কয়েকদিন থেকে ফিরে যায়, আবার অনেকে দুর্বিষহ জীবনের কথা চিন্তা করে ভারতে ফিরে যায় না বলে জয়গুন-নুরুবিবিরা জানান।

পাচারের পর গ্রামে চলে আসা নারী অনেকেই বসতপুর সংস্থার মাধ্যমে হাতের কাজ শিখে নিজেদের মতো করে জীবনযাপনের চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে জয়গুন বসতপুরের ওই সংস্থার মাধ্যমে শিখেছেন টেইলারিংয়ের কাজ, নাহার শিখেছেন বাটিকের কাজ, বেগম শিখেছেন নকশিকাঁথা সেলাইয়ের কাজ ও নুরুবিবিও শিখেছেন টেইলারিংয়ের কাজ। এসব কাজের মাধ্যমেই তারা নিজেরা এখন আয় করে সংসার চালাচ্ছেন। তারা প্রশিক্ষণমূলক এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে সরকারিভাবে ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার দাবি জানান। পাচারের শিকার নারীদের নিয়ে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়নের বসতপুর গ্রামে কাজ শুরু করে বসতপুর মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা। এমআরডিআই'র উদ্যোগে ওই বছরের পহেলা সেপ্টেম্বর এ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। সেখানে পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের দেয়া হয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে টেইলারিং, ব্লক বাটিক, হাতের সেলাই প্রশিক্ষণ ও নকশি কাঁথা সেলাই।

প্রকল্পের সভাপতি রোকেয়া খাতুন বলেন, এ প্রকল্পে তাদের মোট ১৭০ জন সদস্য ছিল। তাদেরকে ২০ জনের দল করে সকাল ও বিকেলে দু'টি গ্রুপ করে পাঁচ মাসব্যাপী চারটি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল। একইসাথে সংস্থাটি প্রশিক্ষণরত নারীর মেয়ে সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি ও ৪৪টি বাইসাইকেল প্রদান করে। কিন্তু ২০২০ সালে এ প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া, যশোর সদরসহ অন্যান্য উপজেলায় পাচারের শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করছে আরও তিনটি সংস্থা। এগুলো হলো, রাইটস যশোর, ঢাকা আহছানিয়া মিশন এবং জাস্টিস ও কেয়ার বাংলাদেশ। তারা পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের শেল্টার হোমে আশ্রয় দেয়া এবং পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়াসহ নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

এসব বিষয়ে বাগআঁচড়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আব্দুল মালেক বলেন, বসতপুর গ্রামের দু'টি কলোনিপাড়ায় পাচারের শিকার বেশ কিছু পরিবার বসবাস করে। তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করেছে ওই সংস্থাটি। ওইসব নারী এখন কাজের মাধ্যমে নিজেরাই উপার্জন করে সংসার চালাচ্ছেন। গ্রামের মানুষও তাদের কাছ থেকে কম খরচে পোশাক তৈরি করতে পারছে। কিনতে পারছে নকশিকাঁথা, বাটিকের কাপড়সহ নানা কিছু। পাচারের শিকার নারীদের স্বাবলম্বী করতে প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য তিনি সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শেষ পর্ব

# জনসচেতনতা কার্যক্রম নেই, শেল্টার হোমেই গুরুত্ব বেশি

- প্রতিরোধমূলক কাজ করছে তিনটি সংস্থা
- মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও সাক্ষীর অভাব প্রধান অন্তরায়

মানবপাচার সংক্রান্ত নানা সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে কিছু সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে। তবে সেগুলোর ভূমিকা পাচার প্রতিরোধে কার্যকর নয়। পাচারের শিকার হওয়া মানুষেরা তাদের স্বাভাবিক জীবন ধ্বংসের পর কখনও উদ্ধার ও আটক হলে 'শেল্টার হোমে' স্বল্প মেয়াদে রেখে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করাই সংস্থাগুলোর মূল কাজে পরিণত হয়েছে। তাদের নানা ধরনের প্রকল্প পাচারের হুমকিতে থাকা সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীকে সচেতন করার কাজেও আসছে না। ফলে যুগের পর যুগ যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার চলছেই। অব্যাহত আছে ভয়ঙ্কর অন্ধকার জগতের দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য।

যশোর, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ জেলার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিতে বর্তমানে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা সীমান্তে বড় ব্যবসার নাম 'মানব পাচার।' এ সীমান্তের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে ইছামতি নদী। নদী পার হয়ে ভারতীয় অংশের বেশকিছু এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও বাকি অংশ ফাঁকা। এ সুযোগে সিন্ডিকেট সদস্যরা কাঁটাতার বিহীন অংশ দিয়ে ভারতে পাচার করছে নারী, শিশু ও পুরুষ। চলতি বছরের ৫ আগস্ট থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আড়াই মাসে মহেশপুর সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভারতে পাচারের সময় ৩৫৩ জনকে আটক করে বিজিবি। এর বাইরে কমপক্ষে আরও আড়াই হাজার মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেছে। তাদের দাবি, মহেশপুরের পাঁচটি সীমান্ত পথে যুগের পর যুগ মানব পাচার চলছে। এটিই সীমান্তের বেশকিছু মানুষের প্রধান ব্যবসা বলে তারা জানান।

এদিকে, ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষা পাঁচটি জেলা যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থার মানব পাচার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম নেই। মাঝে মাঝে কিছু সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম শুধুমাত্র পাচারের সময় সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক নারী ও শিশুদের আদালতের মাধ্যমে হেফাজতে নেয়া এবং ভারতে উদ্ধারের পর যোগাযোগ করে বিএসএফ-বিজিবির মাধ্যমে পুশব্যাক হওয়ার পর তাদের শেল্টার হোমে রাখা। এরপর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে স্বজনদের হাতে তুলে দেয়া। এছাড়া, একটি সংস্থা পাচার থেকে ফিরে আসা নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার প্রকল্প চালু করলেও আট বছর পর তা এখন বন্ধ রয়েছে। এর বাইরে বছরের কোনো কোনো সময়ে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে র‍্যালী বা উঠান বৈঠক করে থাকে দু'একটি সংস্থা।

এদিকে, মানব পাচার প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের একটি কমিটি রয়েছে। এ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক। সদস্য রয়েছেন পাচার প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন এনজিও'র কর্মকর্তারা। তাদের মাধ্যমে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও পৃথক কমিটি

রয়েছে। প্রতি মাসেই এ কমিটির সভায় পাচার সংক্রান্ত মনিটরিংয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ তথ্য জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ে পাঠানো হয়। তবে মাঠ পর্যায়ে পাচার প্রতিরোধমূলক কোন কার্যক্রম এ কমিটির নেই বলে জানিয়েছেন ওই কমিটির সদস্য ও রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক। তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে এ কমিটি কার্যকর ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করলে অনেকাংশে পাচার প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

এ বিষয়ে যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এস এম শাহিন বলেন, জেলা প্রশাসনের পাচার প্রতিরোধ কমিটির সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ইউনিয়ন পর্যায়ে এ কমিটির নেতৃবৃন্দ পাচার প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

যশোরে পাচারের শিকার হয়ে ফিরে আসা হতভাগ্য নারীদের নিয়ে বর্তমানে এ জাতীয় কাজ করছে তিনটি উন্নয়ন সংস্থা। এগুলো হলো, মানবাধিকার সংস্থা রাইটস যশোর, ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও জাস্টিস এন্ড কেয়ার। গত প্রায় দশ বছরে এসব সংস্থা পাচারের শিকার দেড় হাজার নারী শিশু ও পুরুষকে উদ্ধারের পর তাদের শেল্টার হোমে আশ্রয় দিয়েছে। এরমধ্যে রাইটস যশোরের মাধ্যমে ২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৭৮৫ জনকে। এদের মধ্যে নারী ৩৩৬ জন, পুরুষ ১৭১ জন ও শিশু ২৪৮টি। ঢাকা আহছানিয়া মিশন ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোরের ভেকুটিয়া গ্রামে তাদের শেল্টার হোমে আশ্রয় দিয়েছে ৫৪৫ জনকে। এদের মধ্যে নারী ৫২৫ জন ও শিশু ২০জন। এখানে আশ্রিতদের মধ্যে ৪২৮ জন ভারতে পাচারের পর আটক হয়ে বিএসএফের মাধ্যমে পুশ ব্যাক হয়েছে এবং বাকি ১১৭ জন ভারতে পাচারের সময় যশোর, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহের বিভিন্ন সীমান্তে আটক হয়।

রাইটস যশোরের ডেপুটি ডিরেক্টর এসএম আজহারুল ইসলাম বলেন, পাচারের শিকার নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সংস্থা। এই সংস্থাটি মানব পাচার প্রতিরোধে ১৯৯৮ সাল থেকে ৪৭ টি বিষয়ে কাজ করছে। তাদের কাজের প্রধান পাঁচটি বিষয়বস্তু হচ্ছে, প্রিভেনশন, প্রোটেকশন, প্রসিকিউশন, পলিসি ও পার্টনারশিপ। এসব কাজের মাধ্যমে তারা পাচার প্রতিরোধমূলক সভা-সমাবেশ করছে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে, কমিউনিটি মিটিং, বাড়ি বাড়ি গ্রুপ মিটিং, দিবস উদযাপনে শোভাযাত্রা করছে সংস্থাটি। একইসাথে তারা ইউনিয়ন পর্যায়ে মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে স্থানীয় শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যরা সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে সংস্থাটি নয়টি প্রকল্প নিয়ে যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় কাজ করছে। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, পাচারের শিকার নারী ও পুরুষকে স্বাবলম্বী করা। এ প্রকল্পের মাধ্যমেই তারা গত দু'বছরে পাচারের শিকার ৬০ জন নারী-পুরুষকে স্বাবলম্বী করেছে। এদের মধ্যে যশোরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩১ জন। নারী ১০ জন ও পুরুষ ২১ জন। সাতক্ষীরায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৯ জন। নারী ১৫ জন ও পুরুষ ১৪ জন। তাদেরকে কিনে দেয়া হয়েছে, মোটরচালিত ভ্যান গাড়ি, মুদি দোকানের মালামাল, গরু ও ছাগল, চটপটি বিক্রির ভ্যান, পোল্ট্রি ফার্মের সরঞ্জাম, পুকুরে চাষাবাদের মাছ, ইলেকট্রিক দোকানের মালামাল, এমনকি নারীদের ড্রাইভিংও শেখানো হয়েছে। এদের প্রত্যেককে ৬০ থেকে ৮০ হাজার টাকা মূল্যের ওইসব সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাচার থেকে ফিরে আসা নারী-পুরুষদের দুঃসহ জীবনের স্মৃতি ভুলিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

সুবিধাভোগীদের মধ্যে যশোর শহরের বারান্দিপাড়ার লাবু, চায়ের দোকানের ব্যবসার মাধ্যমে বর্তমানে স্বাবলম্বী। এখান থেকে উপার্জনের মাধ্যমে তিনি স্ত্রী ও দু' ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। একইভাবে সংসার চালাচ্ছেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বেনেয়ালী গ্রামের মিরা বিবি (ছদ্মনাম) ও ঝিকরগাছার পৌর শহরের রেলস্টেশনপাড়ার ডালু খাতুন (ছদ্মনাম)। এদের মধ্যে মিরা বিবি মুদিখানা দোকান চালাচ্ছেন ও ডালু খাতুনের স্বামী মোটর ভ্যান চালাচ্ছেন। তাদের পরিবারে এখন অভাব নেই বললেই চলে। স্বামী ও সন্তান নিয়ে তারা এখন সুন্দর জীবনযাপন করছেন।

রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক বলেন, পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের জন্য তারা দু'টি শেল্টার হোম করেছেন। এর একটি শহরের কারবালা এলাকায় এবং অপরটি বেনাপোলের ভবেরবেড় গ্রামে। এখানে তারা পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারীদের নিরাপদে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেন।

পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামে ঢাকা আহছানিয়া মিশন শেল্টার হোম গড়ে তুলেছে। এখানে তারা পাচার থেকে ফিরে আসা নারী ও শিশুদের আশ্রয় দেন। তবে, সেটি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায়, থানা পুলিশ ও আদালতের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এখান থেকেই হতভাগ্যরা ফিরে যায় তাদের পরিবারে।

আশ্রয় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার শাহনাজ পারভীন বলেন,গত ২৫ বছর তারা পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে তারা এ প্রকল্প শুরু করেন। এরমধ্যে ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত পাঁচ বছরে শেল্টার হোমে পাচারের শিকার ৫৪৫ জন নারীকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের সাথে শিশু ছিল ২০ জন। এরমধ্যে ১১৭ জন নারী ভারতে পাচারের সময় সীমান্ত এলাকা থেকে বিজিবির হাতে আটক ও যৌনপল্লী থেকে উদ্ধারকৃত। এছাড়া, ৪০৮ জন পাচারের শিকার হয়ে ভারতে আটক হওয়ার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করলে তাদের শেল্টার হোমে পাঠানো হয়েছে। এখানে তারা ওইসব নারীকে টেইলারিং, মোবাইল সার্ভিসিংসহ নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

অপর সংস্থা জাস্টিস এন্ড কেয়ার পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের নিয়ে একইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ভারতে পাচারের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হওয়াদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করছে।

এছাড়া, বসতপুর মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা পাচারের শিকার ১৭০ নারীকে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ২০১২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়নের বসতপুর গ্রামের হতভাগ্য এসব নারী প্রশিক্ষিত হয়ে তাদের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। ওই নারীরা এখন স্বাবলম্বী, নিজেরা কাজ করেই বর্তমানে তাদের সংসারের হাল ধরেছেন।

বসতপুর মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি রোকেয়া খাতুন বলেন, পাচারের শিকার নারীদের স্বাবলম্বী করতে শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়নে এমআরডিআইয়ের উদ্যোগে

২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কাজ করেছে সংস্থাটি। সেখানে পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ২০২০ সালে এ প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে প্রকল্প অফিস থাকলেও কোনো কর্মকাণ্ড নেই। শুধুমাত্র অফিসটি সভাপতি দেখভাল করছেন।

বাগআঁচড়া শেখ আফিল উদ্দীন ডিগ্রি কলেজের অনার্স পড়ুয়া শিক্ষার্থী নিলুফার ইয়াসমিন নিলা প্রকল্পের কার্যক্রম ফের চালু করার দাবি জানিয়েছেন।

মানব পাচার নিয়ে কাজ করা উন্নয়ন সংস্থা ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক একেএম মাসুদ আলী বলেছেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে মানব পাচার। একইসাথে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে যৌন শোষণের বাজার। এ কারণে যুগের পর যুগ ধরে চলছে মানব পাচার। যা বন্ধে সীমান্তে কার্যকরী পদক্ষেপ, মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও সাক্ষীর অভাব এবং দুর্বলতা প্রধানত দায়ী। এছাড়া, নারীদের ধনী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভন পাচারের অন্যতম কারণ বলে তিনি জানান।

মানবাধিকার কর্মী রাইটস যশোরের কর্মকর্তা বজলুর রহমান বলেন,পাচার মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় পাচারকারীরা অনেকাংশে পার পেয়ে যায়। তিনি এ সংক্রান্ত একটি মামলার সাক্ষী হওয়ার ছয় বছর পর আদালত থেকে সাক্ষ্য দেয়ার নোটিশ পান। কিন্তু দীর্ঘ এ সময়ে তিনি মামলার অনেক ঘটনা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি মামলা সংক্রান্ত এ জাতীয় জটিলতা দূর করার কথা বলেন। তবেই পাচাররোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পাচার সংক্রান্ত মামলা নিয়ে যশোরের আইনজীবী মাসুমা বেগম বলেন, আদালতে পাচার সংক্রান্ত মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। এসব মামলায় প্রায় পাঁচ বছর পর সাক্ষী ডাকা হলে তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না বা সাক্ষী দেয়ার সময় পাচারের ঘটনা তাদের মনে থাকে না। এছাড়া, মামলার রায় হওয়ার পরও সাজাপ্রাপ্ত আসামি আটক হয় না। থানায় ওয়ারেন্ট পাঠানো হলেও পুলিশ তাদের আটকে ব্যর্থ হয়। ফলে, পাচারকারীদের শাস্তি না হওয়ায় তারা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে। এ কারণে বাদীপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে। পাচার বন্ধ হয় না।

এসব ব্যাপারে মহেশপুর বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়নের পরিচালক শাহ আজিজুস শহীদ বলেন, আগের তুলনায় এ উপজেলার সীমান্তে পাচার কমেছে। বিজিবির ব্যাপক নজরদারিতে পদ্ধতি বদলেছে। যার সফলতাও আসছে। পাচার রোধে সীমান্তের ভারতীয় অংশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বিএসএফের সাথে তাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

যশোর ৪৯ বিজিবির অপারেশন অফিসার মাসুদ রানা বলেন, যশোর ও ঝিনাইদহ সীমান্তে বিজিবির ১৪টি বিওপি ক্যাম্প রয়েছে। তাদের কঠোর অভিযানে সীমান্ত এলাকায় বর্তমানে মানব পাচার অনেকাংশে কমেছে। আগামীতে সীমান্ত পথে মানবপাচার জিরো পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গ্রুপ-৫

# ভবদহে জলাবদ্ধদের মানসিক স্বাস্থ্য সমাচার

সরোয়ার হোসেন ও স্বপ্না দেবনাথ

# লেখক পরিচিতি

সরোয়ার হোসেন

সরোয়ার হোসেনের সাংবাদিকতা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে 'সাপ্তাহিক দেশহিতৈষী'তে রিপোর্টার হিসেবে। তিনি মবিনুল ইসলাম মবিনের কাছে ফিচার লেখা শেখেন এবং 'ডেভ ফিচার'-এ লিখেছেন। কাজ করেছেন সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, দৈনিক যশোর, সাপ্তাহিক গ্রামের কাগজ, দৈনিক রানার, দৈনিক প্রভাত ফেরী ও দৈনিক সময়ের খবর-এ। বর্তমানে দৈনিক গ্রামের কাগজ-এর বার্তা সম্পাদক। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে মামলার আসামীও হয়েছেন। তিনি জনস্বার্থ ও জেন্ডার সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছেন। যশোর সরকারি এমএম কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স ও মাস্টার্স করেছেন।

স্বপ্না দেবনাথ

স্বপ্না দেবনাথ বর্তমানে দৈনিক গ্রামের কাগজের সোশ্যাল মিডিয়া এডিটর। ২০১২ সালে দৈনিক নারীকণ্ঠে সাংবাদিকতা শুরু করে ২০১৩ সালে গ্রামের কাগজে যোগ দেন এবং ২০২৩ সালে এডিটর পদে পদোন্নতি পান। তিনি টিআইবি দুর্নীতি বিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার (২০১৯), নিউজ নেটওয়ার্ক বিশেষ পুরস্কার (২০১৮), ইলেকশন রিপোর্টিং ফেলোশিপ (২০২৩) ও এমআরডিআই মেন্টরশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০২৪) অর্জন করেছেন । ২০১৭ সালে স্বপ্ন দেখো ফাউন্ডেশন থেকে সেরা উদীয়মান সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি পান। তিনি উন্নয়ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশ নিয়েছেন।

ভবদহে জলাবদ্ধদের মানসিক স্বাস্থ্য সমাচার

পর্ব: ০১

# জরিপে নতুন উদ্বেগ, ৫০ শতাংশ মানুষের মাঝে গুরুতর বিষণ্নতার লক্ষণ!

যশোরের দুঃখ হিসেবে পরিচিত ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে সাড়ে তিন দশকে নেয়া হয়েছে একের পর এক সরকারি প্রকল্প। ব্যয় করা হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। কিন্তু অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট ছাড়া সমস্যার তেমন কোনো সমাধান হয়নি। উপরন্তু, ভুক্তভোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে গ্রামের কাগজের জরিপে। তথ্য মিলেছে, এ অঞ্চলের ৫০ শতাংশ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে গুরুতর থেকে অতি গুরুতর পর্যায়ের বিষণ্নতা আর ৮৫ শতাংশ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য স্বাভাবিক জীবনে থাকাদের মতো নয়। অধিকাংশেরই মানসিক অবস্থায় রয়েছে বহুমুখী  বিষণ্নতার লক্ষণ। বিষয়টি গুরুতর অভিহিত করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এখনই এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে চলে যেতে পারে।

যশোর এবং খুলনার পাঁচটি উপজেলার মানুষের কাছে ভবদহ 'অভিশপ্ত' হিসেবে পরিচিত। এই পাঁচটি উপজেলা হলো যশোরের মণিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগর এবং খুলনার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা। এসব এলাকার আবাদি জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'সবুজ বিপ্লবের নামে ১৯৬১ সালে অভয়নগরের ভবদহ গ্রামে স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের শুরুতে স্থানীয় চাষিদের মুখে হাসি ফোটে। বৃদ্ধি পায় আবাদি জমির পরিমাণ। উৎপাদন ভালো হয় ফসলের। কিন্তু, স্লুইচগেটের প্রভাবে একদিকে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে উজানের জলপ্রবাহ, অন্যদিকে ভরাট হতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর তলদেশ। এতে নদ-নদীগুলো নাব্য হারিয়ে নিষ্কাশনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যার খেসারত হিসেবে উজান থেকে আসা পানি এবং অতিবৃষ্টির কারণে ভবদহ এলাকায় দেখা দেয় অস্থায়ী ও স্থায়ী জলাবদ্ধতা। একটু বৃষ্টিতেই নদীর দু'কুল ছাপিয়ে প্লাবিত হয় সমতল। ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় দুর্যোগের মধ্যে দিনযাপন করতে হয় এখানকার বাসিন্দাদের। চার দশকের বেশি সময় ধরে চলমান এ

সমস্যা সমাধানে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন সরকার। তবে, কোনো সরকারের আমলেই স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। সত্যিকার অনুসন্ধানের চেষ্টাও চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। বরাবরের মতো এবছরও আগস্টের মাঝামাঝি সময় হতে যশোরের কেশবপুর, মণিরামপুর এবং অভয়নগরের প্রায় চার লাখ মানুষ পানিবন্দি এবং ৬৫ শতাংশ মানুষের বসতভিটায় হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পানি জমেছে।

দীর্ঘদিনের এ সমস্যায় এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশে দেখা দিয়েছে নানা বিরূপ প্রভাব। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা গবেষণাও করেছে প্রচুর। কিন্তু দৈনিক গ্রামের কাগজ ভিন্নধর্মী এক জরিপ চালালে উঠে এসেছে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগজনক তথ্য। যশোরের ছয় উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার দেড়শ'র বেশি জলাবদ্ধ ও জলাবদ্ধ নয় এবং স্বাভাবিক জীবনে থাকা মানুষের সাক্ষাৎকারভিত্তিক জরিপ করা হয়েছে। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ এবং অক্টোবর মাসে গ্রামের কাগজের এই প্রতিবেদকরা সরেজমিনে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এতে জলাবদ্ধ প্রায় সকল বয়সী মানুষের মধ্যে গুরুতর দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, মানসিক চাপ ও বৈকল্যের মতো জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার তথ্য পাওয়া গেছে।

> বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানসিক স্বাস্থ্য হলো মনের এমন এক ভালো থাকার অনুভূতির অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজের ভেতরের দক্ষতাগুলোকে কার্যকর করে তুলতে পারে। জীবনের স্বাভাবিক মানসিক চাপগুলো মোকাবেলা করতে পারে, উৎপাদনশীল ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে এবং তার নিজ সমাজে সে অবদান রাখতে পারে।

সাক্ষাৎকার ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে এ দু'এলাকার মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নিরূপণে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরিতে গ্রামের কাগজকে সহযোগিতা করেছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

দু'মাসের এ অনুসন্ধানে গ্রামের কাগজ উত্তর খুঁজেছে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা এ অঞ্চলের মানুষের মনের উপর কী কী প্রভাব ফেলছে, প্রভাবের ফলাফল কী হতে পারে এবং এর সম্ভাব্য সমাধান কী।

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের বাইরে প্রতিবেদকরা কথা বলেছেন জলাবদ্ধ এলাকার সকল বয়সী ভুক্তভোগী, এনজিও কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞসহ অন্ততঃ সহস্রাধিক মানুষের সাথে। যারা এ বিষয়টির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। সেই কথোপকথন থেকেও এ অঞ্চলের মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, চিত্তবিনোদনের সুযোগ, অর্থনৈতিক অবস্থা, সর্বোপরি স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগের অভাবের মতো নানা বিষয় উঠে এসেছে।

জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয় ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদের কাছে। তিনি বলেন, 'বিষয়টি উদ্বেগজনক। সর্বশেষ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৯ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক বিষণ্নতার হার ছয় দশমিক সাত শতাংশ। সেই হিসেবে এ অঞ্চলের প্রাপ্ত বয়স্ক ৫০ শতাংশ মানুষের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণ সাধারণ হারের চেয়ে সাতগুণ বেশি।' বিশেষজ্ঞ দ্বারা আরও যাচাই করে এটি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন বলেও মত দেন তিনি।

## সার্বিক চিত্র

গ্রামের কাগজের জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকায় ৮৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মানসিক বিষণ্নতার লক্ষণ রয়েছে। এরমধ্যে নারী ৯০ দশমিক ৫ শতাংশ এবং পুরুষ ৮২ দশমিক ৫ শতাংশ। সেই হিসেবে মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে মানসিক বিষণ্নতার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। জলাবদ্ধ নয় এমন এলাকার মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা না থাকার এ হার ৭০ শতাংশ।

জরিপের ফলাফলে পাওয়া গেছে জলাবদ্ধ তিনটি উপজেলার ৫০ শতাংশ মানুষের বিষণ্নতার লক্ষণ গুরুতর থেকে অতি গুরুতর পর্যায়ে। এর মধ্যে নারী ৫০ শতাংশ এবং পুরুষ ৪৫ শতাংশ। এছাড়া, হালকা বিষণ্নতার লক্ষণে ভুগছেন ৩৩ শতাংশ মানুষ। এসবের প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে চলমান জলাবদ্ধতায় সৃষ্ট সংকট। অর্থাৎ এর পেছনে দায়ী দীর্ঘ জলাবদ্ধতা।

## ঠিকমতো ঘুম হয়না ৫৯ শতাংশ মানুষের

হরিদাসকাটি ইউনিয়নের কুচলিয়া গ্রামে বাবার বাড়িতে আছেন সন্তানসম্ভবা চৈতি মল্লিক। সরেজমিনে দেখা গেছে তাদের মাটির ঘরের মধ্যে পানি উঠে পড়েছে। ঘরের একপাশের মাচায় গরু ছাগল, আরেক পাশে পরিবারের সবার বসবাস। চৈতি জানান, 'দিনরাত ঘরে বসে থাকতে থাকতে শরীর অবশ হয়ে যায়। একটু শান্তিমতো ঘুমাতেও পারিনা। চোখ বুজলেই মনে হয় এই বুঝি সাপ আসলো।'

চৈতির বাবা অসীম মল্লিক জানান, সাপের ভয় এখন আর তার নেই। সর্বক্ষণ ভয় মেয়েকে নিয়ে। এ সময়ে মেয়ের জন্য ভালো পুষ্টিকর খাবার দরকার, কিন্তু তিনি তা দিতে পারছেন না। মেয়ের জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি থাকার প্রয়োজন তাও নেই। সেই চিন্তাতেই তিনি ঘুমাতে পারেন না।

> প্রায় প্রতিবছর জলাবদ্ধতার অমীমাংসিত দুঃখ ভবদহবাসীর দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। শিশু, নারী ও বয়স্করা বেশি ঝুঁকিতে থাকছেন, চিত্তবিনোদনের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ, পরিমিত খাবার, পানীয় এবং শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগও সীমিত এখানে।

কুচলিয়ার অসিত বিশ্বাস, হরিচাঁন মন্ডল, মিরা বিশ্বাস, দিপালী রায়ও একই কথা জানান। তারা বলেন, দিনরাত তাদের কাছে সমান। আয় রোজগার নেই, পেটে ভাত নেই, সেই সাথে নেই এই পরিস্থিতি থেকে সহসা উত্তরণের কোনো আশা। তাই নির্ঘুম রাত কাটে।

জরিপে উঠে এসেছে এ এলাকার ৫৯ শতাংশ মানুষের ভালো ঘুম হয় না। এর অন্যতম কারণ হিসেবে জরিপে উঠে এসেছে জলাবদ্ধতায় সৃষ্ট সংকট এবং সমস্যা। তবে, জলাবদ্ধ নয় এমন এলাকার মানুষের মধ্যেও ঠিকমতো ঘুম না হওয়ার হার প্রায় কাছাকাছি। সাক্ষাৎকারভিত্তিক জরিপে উঠে এসেছে জলাবদ্ধ নয় এমন এলাকার ৫৫ শতাংশ মানুষের ঘুম ভালো হয় না। কারণ হিসেবে বেশি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। এ এলাকার উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ ভাগ জানিয়েছেন, তারা অনেক রাত অবধি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকেন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় বলে ঘুমের ঘাটতি থেকে যায়।

## দৈনন্দিন জীবনের ব্যাঘাত

জলাবদ্ধতা এ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত করছে। এই ব্যাঘাতের ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে চাপ এবং হতাশা বেড়ে যাওয়াতে তাদের স্বাভাবিক রুটিনগুলি চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ছেন।

কেশবপুরের সুফলাকাটি ইউনিয়নের কালীচরণপুর গ্রামের কৃষ্ণ মন্ডল জানান, তার কাছে একটি দিন শেষ হওয়া মানে আরও অনিশ্চয়তা। তিনি বলেন, 'কৃষি কাজ করে জীবন বাঁচানো মানুষগুলোর জীবনও এখন জলে ডুবে থাকা কৃষি জমির মতো নিষ্ফলা!' অভয়নগরের সাড়াডাঙ্গা গ্রামের অনুপম ঠাকুর, মশিয়াহাটির মাধাই সরকার, ভাটবিলার তাপস মন্ডলও একই কথা জানান। শুধু এ মানুষগুলো নয়। জলাবদ্ধ এ অঞ্চলের প্রায় ৭৮ শতাংশ মানুষ প্রতিদিনকার কাজে আনন্দ পাননা এবং কাজকর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন শতকরা ৬৫ জন। এছাড়াও জরিপে উঠে এসেছে জলাবদ্ধ ৮৫ শতাংশ মানুষের প্রতিদিনকার আবশ্যিক কাজে ক্ষতি হচ্ছে।

## দুর্ভোগ গেলেও থেকে যায় ক্ষত

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে বাড়ির উঠানে জমে থাকা পানিতে ডুবে মৃত্যু হয় সাত বছরের শিশু অর্পণ মল্লিকের। এরপর আরও কয়েকবার স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার হতে হয়েছে অর্পণের পরিবারকে। প্রতিটি ক্ষণ সন্তান হারানোর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় অর্পণের মা বাবাকে। জলাবদ্ধ বাড়ির উঠোন আর লম্বা বাঁশের সাঁকো শুধু সন্তানের মরা মুখ মনে করায় উল্লেখ করে অর্পণের বাবা রামসরা গ্রামের বিপ্লব মল্লিক বলেন, 'উঠানে সাঁকোর নীচ থেকে ছেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই জল আমাদের আজীবনের কান্নার কারণ। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা যে কী তা বলে বোঝানো যায়না। পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে এলাকার শিশুদের কোমরে দড়ি বেঁধে রাখা হয়। শিশুগুলোর জীবনও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে'।

শুধু বিপ্লব মল্লিক দম্পতি না, এমন কষ্টের গল্প গত চার দশকে ভবদহ অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য। কেউ জমে থাকা পানিতে শিশু সন্তানকে চিরতরে হারিয়েছেন। আবার শেষ ইচ্ছা অনুসারে চিরঘুমের জন্য প্রিয়জনের কবরের পাশে জায়গা হয়নি অনেকের।

বৃদ্ধ বয়সে এসে কেশবপুরের পাঁজিয়া ইউনিয়নের মাদারডাঙ্গা গ্রামে বাবার বাড়িতে এসে স্থায়ী হন নবু বেগম নামে এক নারী। তার শেষ ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর পর যেন তার বাবার পাশে কবর দেয়া হয়। কিন্তু জলাবদ্ধতার কারণে তার সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি নবু বেগমের ভাইয়েরা। আলী বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি জানান, নবু বেগম তাদের চাচাতো বোন। ২০২২ সালে তার মৃত্যু হয়। মারা যাওয়ার পর মাদারডাঙ্গা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কবরস্থান পানিতে তলিয়ে থাকায় তাকে সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কেশবপুর সদরের মধ্যকূল গ্রামের উত্তরপাড়ার সিরাজুল ইসলামের মৃত্যু হয়। তার মরদেহ নৌকায় করে পারিবারিক কবরস্থানের পাশের উঁচু জায়গায় দাফন করতে হয়েছে।

মণিরামপুরের হরিদাসকাটি গ্রামের ওহাব আলী জানান, 'বেঁচে থাকতে তো সুখ নেই, মরণের পরও যে কবরটা ভালোভাবে হবে ভবদহের পানিতে ডোবা মানুষের জন্য সে নিশ্চয়তা নেই'।

## মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ প্রকট হচ্ছে

সাক্ষাৎকারভিত্তিক জরিপের জন্য কেশবপুরের পাঁজিয়া বাজার এলাকায় যান গ্রামের কাগজের দু' প্রতিবেদক। এ সময় মনোহরনগর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা তাদের দুর্ভোগ বর্ণনা করতে করতে চড়াও হন প্রতিবেদকের উপর। তাদের অভিযোগ, জলাবদ্ধ এ মানুষদের ভোগান্তিকে পুঁজি করে এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করলেও তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়না। একপর্যায়ে তারা গ্রামের কাগজের উদ্দেশ্য বুঝে শান্ত হন এবং নিজেরাই অন্য ভুক্তভোগীদের কাছে নিয়ে যান। নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করে তারা জানান, অন্য এলাকার মতো তারা প্রতিবছর জলাবদ্ধতার শিকার হন না। ছয় বছর পর এবার ফের তাদের এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের পরিবর্তন হয়ে গেছে তাদের। অল্পতেই রেগে যাচ্ছেন। কেউ ভালো বা উপকারের কথা বললেও তা বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনোহরনগরের এ বাসিন্দারা নন, অন্য জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের মধ্যেও এ লক্ষণ রয়েছে বলে তারা স্বীকার করেছেন। কোনো কিছু চিন্তা করতে না পারা; কিছু বলতে গিয়ে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পাওয়া এখন অনেকের কাছে নিত্য দিনের বিষয়। সাক্ষাৎকার দাতাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ মানুষ সহজেই ভয় পেয়ে যান। অল্পতে কান্না পায় ৪০ শতাংশের। ঠিকমতো চিন্তা করতে সমস্যা হয় ৩৫ শতাংশ মানুষের আর কোনো লোক ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বলে মনে হয় ২৯ শতাংশের।

## হীনমন্যতার চাপ বাড়ছে

এখনো প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি সুন্দলী গ্রামের দু'শিশু সপ্তর্ষি মল্লিক ও তাথৈ সরকার। গরুর জন্য আলাদা করে বানানো থাকার জায়গায় খেলছিল এই দু'শিশু। জলাবদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে তারা জানান, আত্মীয়স্বজন সকলে ফোন করে জানতে চান তারা কেমন আছে। অনেকে তাদের বাড়িতে চলে যেতে বলেন। তারা স্কুলে ঠিকঠাক যেতে পারে না শুনে অন্যরা দুঃখ করে এসব তাদের ভালো লাগেনা। তাথৈ আর সপ্তর্ষি নয় এমন হীনমন্যতার চাপ বাড়ছে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যেও। সুন্দলী গ্রামের বাসিন্দা মুক্তেশ্বরী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক কানু বিশ্বাস বলেন,'আমাদের জীবনের সাথে জলাবদ্ধতার এ দুর্যোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রচেষ্টার শেষ নেই। আন্দোলন সংগ্রাম থেকে শুরু করে সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবায় কাজ করেও যখন পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়না, তখন নিজেদেরকে অপরের করুণার পাত্র হিসেবেই পরিচয় দিতে হবে'।

হরিদাসকাটি গ্রামের গৃহবধূ সুপ্রিয়া রানী জানান, দশ বছরের বিবাহিত জীবনের প্রায় প্রতি বছরই গরু ছাগল নিয়ে তাকে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠতে হয়েছে মাস কয়েকের জন্য। বাপের বাড়িতে এমনি বেড়াতে যাওয়া আর না চাইতেও যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন তার মতো অভিজ্ঞতা এ এলাকার অনেক গৃহবধূর আছে। পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক এতে দৃঢ় হওয়ার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত হয়। নিজেকে অন্যের কাছে ছোট মনে হয় বলে যোগ করেন তিনি।

## ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তি আর মানসিক অস্থিরতা নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠছে

বর্ষার পর প্রায় প্রতি বছরই কয়েক মাসের জন্য স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য বেশ পুরানো। জীবনের অন্তত চার দশক পার করা প্রত্যেক

বাসিন্দা ছোটবেলা থেকেই এর সাক্ষী বলে জানিয়েছেন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীগণ। তবে, অতীতের চেয়ে বর্তমানে তাদের সমস্যা বেশি বলে অনুভব করছেন তারা। ক্ষুধামন্দা, হজম শক্তি কমে যাওয়া বা সহজে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা অনেকের নতুন করে দেখা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন এটি এখন তাদের স্থায়ী শারীরিক সমস্যা। জরিপে অংশ নেয়া ৫০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তাদের ক্ষুধা কম লাগে। হজম শক্তি কম ৪২ শতাংশ মানুষের, আর সব সময় ক্লান্তি বোধ করেন ১৮ শতাংশ মানুষ। জলাবদ্ধ না এমন এলাকার মধ্যে এ হার ১০ শতাংশেরও কম।

## আত্মীয়তা করতে চায় না অনেকে

অভয়নগর ডুমুরতলা গ্রামের ভানু মন্ডল। বাড়িতে প্রায় কোমর পানি। প্রতিটি ঘরের সাথেই আছে বাঁশের সাঁকো। নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'যে ভোগান্তি চোখে দেখা যায় সেটা তো সাংবাদিক লেখে, যা দেখা যায় না তাতো লেখে না।' দেখা চোখের ভোগান্তির চেয়ে না দেখা সমস্যা আরও প্রকট বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, তাদের এলাকার মানুষের সঙ্গে এখন অনেকেই আত্মীয়তা করতে চায় না। তিনি আরও বলেন, আসলে বাইরের মানুষ জলাবদ্ধতার কষ্ট বোঝেনা! মেয়ের বিয়ে কোনোমতে দিতে পারলেও ছেলে বিয়ে দিয়ে বউ আনতে গেলে আমাদের ভোগান্তি বেশি।

ডহর মশিয়াহাটি গ্রামের বিজলী মন্ডল বলেন, 'যে বছর একটু বেশি বৃষ্টি হয়, বাড়িঘরে জল জমে, কন্যা দায়গ্রস্ত বাবা মায়ের চিন্তা আরও বাড়ে। ধরে নিতি হয় ছেলে মেয়েদের বিয়ের জন্যি বাড়িতে নতুন কুটুম আসা অন্তত ছয় মাসের জন্যি বন্ধ।'

হাটগাছা গ্রামের অনামিকা বিশ্বাস বলেন, 'আমাগের বাবা মা না জেনে বুঝে একপ্রকার আমাগের জলে ফেলে দেছে। কিন্তু এখনকার বাবা মা সচেতন। হাজার সচ্ছল ঘর আর ছেলে ভালো হলেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দেখে মানুষ। ভবদহের বাইরের লোক অনেকে এ এলাকায় ছেলে বিয়ে দিলেও মেয়ে বিয়ে দিতে চান না।'

## নিরাপত্তার অভাব

বাড়িতে জমা পানি এতটাই বেশি যে, কেশবপুর উপজেলার যশোর-সাতক্ষীরার ব্যস্ততম সড়কের মধ্যকুল আমতলা ও গুটলেতলা এলাকায় শতাধিক পরিবার ঝুঁপড়ি ঘর বেঁধে বসবাস করছিল। হাবাসপোল গ্রামের জাহানারা বেগম জানান, ঝুঁপড়ি ঘর তৈরি করে সেখানে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসবাস করেন তারা। হাইস্পিডে পরিবহনসহ আরও অনেক গাড়ি চলে। এ পরিস্থিতিতে সড়কের পাশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করতে হয় তাদের। কুলছুম, সাথিয়ারা ও কল্পনা রানী জানান, সর্বক্ষণ তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। একদিকে পানির মধ্যে ফেলে আসা বাড়িঘর আর জিনিসপত্রের চিন্তা, অন্যদিকে কাগজের বেড়ার ঘরে রাত্রিযাপন। পুরুষ ছেলেরা কোনোমতে দিন পার করলেও নারীদের জন্য বহুমুখী বিড়ম্বনা আর নিরাপত্তার অভাব থাকে বলে জানান তারা।

পর্ব: ০২

# নানা সমস্যায় বাড়ছে চাপ দিন-রাত নিদারুণ অস্বস্তি

মণিরামপুরের কুলটিয়া ইউনিয়নের মহিষদিয়া গ্রাম। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এ গ্রামে গেলে দেখা যায় নৌকা বা তালের ডোঙ্গা-ই (তাল গাছ দিয়ে তৈরি ছোট জলযান) যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। নৌকায় চেপে গ্রামের কাগজের এই প্রতিবেদকরা পৌঁছান নিপা বিশ্বাসের উঠানে। শাশুড়ির সাথে বারান্দায় বসে থাকা গৃহবধূ নিপা বলেন, 'এখন আমাদের অখণ্ড অবসর। কোনো মতে দুটো রান্না করা ছাড়া আর কাজ নেই। উঠোনে হাঁটু জল।' পরিস্থিতি বর্ণনা করে নিপা বলেন, 'নিজেদের পায়খানা, বাথরুম জলে ডোবা। পাশের বাড়িরটা ব্যবহার করি। পেটভরে ভাত খেতে পারিনা টয়লেট চাপার ভয়ে'।

নিপা বিশ্বাসের মতো জলাবদ্ধ এলাকায় জরিপের জন্য যে ৬০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের ৭৫ ভাগেরই শৌচাগার পানিতে ডোবা এবং নিজস্ব কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। নিরুপায় হয়ে অন্যের বাড়ি কিংবা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তৈরি করে দেয়া অস্থায়ী গণশৌচাগার ব্যবহার করছেন ভুক্তভোগীরা।

ভবদহ এলাকার মানুষের নিত্য সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এসব। যার কারণে তাদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সবসময় এসব নিয়ে অস্বস্তিতে থাকতে হচ্ছে ভুক্তভোগীদেরকে। প্রত্যন্ত এলাকায় সরেজমিনে গেলে মানুষ তুলে ধরেছেন নিজেদের দুর্ভোগের নানা কাহিনি। শৌচাগার না থাকার পাশাপাশি তারা উল্লেখ করেছেন শিশুদের লেখাপড়ায় মনোযোগী না হতে পারার কথা। কাজের অভাবে বাধ্যতামূলক বেকারত্বের শিকার হয়ে অলস সময় কাটাচ্ছেন অধিকাংশ কর্মক্ষম মানুষ। নেই বিকল্প আয়ের তেমন কোনো উৎস। সে কারণে পরিবারের সদস্যদের ঠিকভাবে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জুটছে না। ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন তারা। এনজিওর কিস্তি মাথায় নিয়ে দিন-রাত অস্বস্তিতে থাকতে হচ্ছে সবাইকে। অনেকে হাত-পায়ে ঘা-পাঁচড়াসহ পানিবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। পরিস্থিতির অবনতিতে ভবদহ এলাকার বহু মানুষ পরিবেশগত অভিবাসীও হচ্ছেন।

গ্রামের কাগজের প্রতিনিধিরা ঘুরে বেড়িয়েছেন ভবদহ অধ্যুষিত যশোরের ছয়টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকা। কখনো হাঁটুসমান পানি পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকা বা ডোঙায় চড়ে বুক সমান পানি পার হয়ে গেছেন প্লাবিত বাড়িঘরগুলোতে। দেখেছেন ভুক্তভোগীদের অবর্ণনীয় দুঃখ, দুর্দশা। চায়ের দোকান থেকে গ্রামের মোড় কিংবা রাস্তায় আশ্রয় নেয়া জলাবদ্ধতার শিকার মানুষের সাথে কথা বলে জেনেছেন সবিস্তার। সর্বত্রই দেখা গেছে ভবদহ এলাকার মানুষের দিন শুধু দুর্ভোগে কাটে না, সাথে আছে অবর্ণনীয় অস্বস্তি।

## ভোগান্তিতে ধনী-গরীবের ভেদাভেদ নেই

জলাবদ্ধ এলাকার প্রতিটি মানুষের অবর্ণনীয় মানসিক চাপ আর সীমাহীন দুর্ভোগের কথা উঠে এসেছে অনুসন্ধানে। জলাবদ্ধ নয় এমন জীবনে থাকা মানুষদের এসব অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্য। অনুসন্ধানকালে অভয়নগরের সুন্দলী এসআর স্কুল অ্যান্ড কলেজের বহুতল ভবনে গবাদি পশু নিয়ে থাকছিলেন অন্তত ২০টি পরিবার। দুর্দশা বর্ণনা করে বিথীকা কবিরাজ জানান, অর্থবিত্ত থাকলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতির কাছে অসহায় সকলে। 'ঘরটি মাটির, নাকি ছাদের-জল তা দেখে না' উল্লেখ করে তিনি বলেন 'আমরা এখানে মানুষ আর গরু ছাগল সবাই একই রকমভাবে বাঁইচে আছি।'

কপালিয়া থেকে মশিয়াহাটি যেতে দেখা যায় গবাদি পশুর জন্য শুকনো স্থানে থাকার ব্যবস্থা করতে উঁচু রাস্তার ধারে ঘর বানিয়ে গরুর সাথে থাকছেন অনেকে। এমনই একজন কুলটিয়া গ্রামের সুষমা লস্কর। রাস্তার ওপর তৈরি গোয়াল ঘরে গরুকে খাবার দিতে দিতে জানান, দিনে নারীরা গরুর পরিচর্যা করলেও রাতে পুরুষরা গরুর সাথে থাকেন রাস্তায়। এই জলাবদ্ধতা তাদের রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। স্বপ্না শিকদার নামে আরেক নারী বলেন, 'সামাজিক অবস্থান বা অর্থবিত্ত থাকা মানুষগুলো আরও বেশি বিপদে থাকেন। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে স্কুল, কলেজ কিংবা উঁচু রাস্তায় গিয়ে থাকেন। এ মানুষগুলোর পক্ষে তাও সম্ভব হয় না।' পোড়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, 'আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও জলাবদ্ধ পরিস্থিতিতে রান্নার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় অনেককে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। বাড়ির ছোট্ট শিশুটিও খাবার সময় চিন্তা করে আগামী দিনের ব্যবস্থা কী হবে! এটা কতটা কষ্টের তা যারা ভুক্তভোগী তারাই বোঝেন!'

## ত্বকের অসুখে ভুগছেন প্রায় সকল নারী-পুরুষ

জলাবদ্ধতার শুরু থেকে এ এলাকার মানুষের মধ্যে বাড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন চর্মরোগ। মনোহরপুর বয়ারখোলা গ্রামের পার্বতী গুলদার পাঁজিয়া বাজার থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরছিলেন। জানালেন, সুপেয় খাবার জলই জোটে না তো স্নানের জল। ভালো এবং পচা জল মিলেমিশে একাকার। এ জলে স্নান করে তার পুরো শরীরে চুলকানি হয়েছে। দিন যত যাচ্ছে বাড়ির অন্যরাও আক্রান্ত হচ্ছেন।

কুলটিয়া ইউনিয়নের হাটগাছা গ্রামের প্রতিটি বাড়ি জলাবদ্ধ। মশিয়াহাটি ডিগ্রি কলেজে কর্মরত এ গ্রামের বাসিন্দা বিরাট মল্লিক বলেন, না চাইলেও ঘর গৃহস্থালির কাজের জন্য সকলকে পানিতে ভিজতে হয়। দিনের অধিকাংশ সময় ভেজা থাকার কারণে হাত পায়ে ঘা হয়ে গেছে অনেকের। এ গ্রামের মান্দারী মন্ডল ও মালতি বালা জানান, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে চর্মরোগের সমস্যা বেশি। অধিকাংশের হাতে ও পায়ে ঘা হয়ে গেছে।

গ্রামের কাগজের সাক্ষাৎকারভিত্তিক জরিপে পাওয়া গেছে, জলাবদ্ধ এলাকার ৮৮ ভাগ পরিবারের কেউ না কেউ খোসপাঁচড়া, আঙুলের মাঝখানে ঘা জাতীয় নানা ধরনের ত্বকের অসুখে ভুগছেন।

## কাজ নেই, সাথে ঋণের বোঝা

ভবদহ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজ এবং মাছচাষের সাথে সম্পৃক্ত। দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ফসলের ক্ষেত, মাছের ঘের ডুবে গেছে, বাড়িঘরের

মধ্যেও অনেকের পানি জমে আছে। এলাকায় নেই চাহিদা মাফিক কাজ। বাধ্য হয়ে বেকার বসে থাকতে হচ্ছে স্থানীয় অনেক কর্মক্ষম নারী-পুরুষকে। এ অবস্থায় অর্ধাহারে-অনাহারে জীবন কাটাচ্ছেন তারা।

কেশবপুর উপজেলার সুফলাকাটি ইউনিয়নের কালীচরণপুর গ্রামের নুপুর বিশ্বাস বলেন, যে পরিস্থিতি তাতে জীবনে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটা সহজ সমাধান এখন। 'ঘরের দুয়োরে শান্তিমতো বসার উপায় নেই। পেটে ভাত নেই, তার সাথে আবার আছে সপ্তায় সপ্তায় কিস্তির টাকা যোগাড়ের চিন্তা।'

আড়পাড়া গ্রামের মুড়ি বিক্রেতা প্রভাত রায় বলেন, 'পরিবারের সাতজন সদস্য নিয়ে খেয়ে না খেয়ে রয়েছি। বাড়িতে মুড়ি ভেজে বিক্রি করি। চারদিকে জল, মুড়ি ভাজার মতো পরিবেশ নেই'।

সুন্দলী ইউনিয়নের ডহর মশিয়াহাটি গ্রামের প্রশান্ত মন্ডল বলেন, 'এ অঞ্চলে অসংখ্য মাছের ঘের আছে। সব ভেসে গেছে। অনেক বড় মাছচাষি আছেন, কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ, তাদের ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। আর ছোট চাষি যারা ১০-১৫ লাখ টাকা খাটিয়েছেন, তাদের এখন পথে বসার অবস্থা।

## ত্বকের অসুখে ভুগছেন প্রায় সকল নারী-পুরুষ

কেশবপুর বালিয়াডাঙ্গা দেবালয় মন্দিরের রাস্তায় এক বছরের নাতি পিয়াসকে নিয়ে হাঁটতে এসেছিলেন পূর্ণিমা পাল। তিনি জানান, আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে পিয়াস হাঁটা শিখেছে। আর সে সময়ই তাদের বাড়ি জলাবদ্ধ হয়। অবস্থা এমন যে ঘরের মধ্যেও পানি। দিন কাটছে খাটের উপর। কোলে থেকে থেকে খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে শিশুটি।

দিনভর আধো আধো কথা আর উঠোন জুড়ে ছুটোছুটি যার নিত্য কাজ ছিল পাঁজিয়া মধ্যপাড়ার সেই শিশু প্রমিতা রায়ও এখন পানিবন্দি জীবন পার করছে। তার মা শম্পা বৈরাগী জানান, দিনের সব সময় প্রমিতাকে কোলে কোলে ও চোখে চোখে রাখতে হয়। তার বাড়ির উঠোনে প্রায় ডোবা জল। শিশুদের মধ্যে যারা ছয় বছরের গণ্ডি পেরিয়েছে তারাও বিপাকে। শৈশবের দুরন্তপনায় ছেদ পড়েছে এসব শিশুর জীবনে। বাইরে ছুটাছুটি বা খেলার সুযোগ নেই। শহরের মতো প্রান্তিক অঞ্চলের ঘরবন্দি এ শিশুদের দিনের বেশিরভাগ সময় এখন সঙ্গী মোবাইল ফোন। কারও সময় কাটছে চায়ের দোকানে রঙিন সিনেমার গল্পের সঙ্গে, না হয় কেরাম বোর্ডে।

জলাবদ্ধতার কারণে পরিবেশ না থাকায় ভবদহের কয়েকশ' স্কুল ও কলেজে পাঠদান ব্যাহত হয়। পুরোপুরি পরিবেশ না থাকায় বন্ধ থাকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। পাঠদান ব্যাহত হওয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থী। বিশেষ করে শিশুদের উপর এর প্রভাব পড়েছে বেশি বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অনন্যা বৈরাগী অনুসন্ধানকালে বলছিল, 'বাইরের অনেকে মনে করেন স্কুল বন্ধ, আমাদের মনে কত আনন্দ! তারা যদি একবার এখানে আসত তাহলে বুঝতে পারতো কত আনন্দে আছি। রোজ কাদাজল মাড়িয়ে স্কুলে গেলেও তো বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা হয়। একটু বাইরে থাকতে পারি। কিন্তু তাও হয় না। খেলার জায়গা নেই, বাথরুমের সমস্যা। শুধু মনে হয় ম্যাজিক করে কেউ যদি সব জল নিয়ে নিত'।

হরিদাসকাটি পাঁচবাড়িয়া গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিলাল মল্লিক বলেন, 'অবাধে উড়ে

বেড়ানো পাখিকে হঠাৎ খাঁচায় বন্দি করলে যে দশা হয়; শিশুদের অবস্থা এখন অনেকটা সেরকম। এটা তো ওদের পরিবেশ নয়। পরিস্থিতির শিকার হয়ে প্রবীণরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ওরা (শিশুরা) এখনো অভ্যস্ত হতে পারেনি।'

সুন্দলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বালিদহ পাঁচকড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মশিয়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ ১০টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী জানিয়েছে স্কুলে ক্লাস করতে না পারা, বিদ্যালয় জলমগ্ন থাকার কারণে তারা প্রায় সকলেই আগামী জীবন নিয়ে চিন্তিত ছিল। বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে জমা পানি তাদের ভবিষ্যৎও ডুবিয়ে দিচ্ছে বলে আশঙ্কা তাদের।

## পরিবেশগত অভিবাসীতে পরিণত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম

খুলনা বিএল কলেজে লাইব্রেরিয়ান পদে কর্মরত আছেন সমীর কান্তি বিশ্বাস। তার বাড়ি অভয়নগর উপজেলার সুন্দলী ইউনিয়নের ভাটবিলা গ্রামে। স্ত্রী সঞ্চিতা সরকার কর্মরত একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। একসময় পরিবার পরিজন নিয়ে সকলে গ্রামে থাকলেও প্রায় প্রতি বছর জলাবদ্ধতার কারণে ১০ বছর আগে এ পরিবার চলে যায় নওয়াপাড়ায়। সঞ্চিতা সরকার বলেন, তার ও স্বামীর এখনো গ্রামে ফেরার ইচ্ছা থাকলেও সন্তানরা চান শহরে স্থায়ী হতে।

এক সময় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মাছের ঘেরে কাজ করলেও এখন যশোর শহরে রিকশা চালান মণিরামপুর উপজেলার হরিদাসকাটি ইউনিয়নের হোগলাডাঙ্গার সুজন দাস। স্ত্রী বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন উল্লেখ করে সুজন জানান, বাবা-মা বাড়িতে আছেন। শ্বশুরবাড়ি বনগ্রাম জলাবদ্ধ। এলাকায় কাজের সুযোগ যেমন নেই, তেমনি বছর বছর ভোগান্তি। বাপ-দাদার ভিটে-মাটির মায়া ত্যাগ করে তাই কয়েক মাস থেকে তারা শহরে এসে থাকছেন। নয় বছরের ছেলে রাজনকে নতুন বছরে শহরের স্কুলে ভর্তি করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

শুধু সমীর কান্তি কিংবা সুজনের পরিবার নয় । জলাবদ্ধতার শিকার ৩৬টি পরিবারের মধ্যে ১৪টি পরিবার জানিয়েছে, ভালো বিকল্প পেলে এ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র স্থায়ীভাবে চলে যাবে। বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের নিজ এলাকার বাইরে থাকার, এমনকি দেশ ছাড়ারও রেকর্ড রয়েছে!

পর্ব: ০৩

# দিনদিন বাড়ছে সমস্যা, প্রতিকারে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ রয়েছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির কারণগুলো একইসাথে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তারা বলছেন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা শুধু ব্যক্তির নিজের চিন্তাভাবনা, আবেগ, আচরণ এবং অন্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না; একইসাথে কার্যকর সামাজিক সুরক্ষাবলয়, পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান, কাজের অবস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সামাজিক সহায়তা এবং চিকিৎসাসেবার একটি শক্তিশালী স্তরভিত্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিরাজমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত অবস্থার ওপরেও নির্ভর করে। যশোরের জলাবদ্ধ ভবদহ এলাকার মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের দুর্যোগময় প্রকৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার প্রভাবটিও অনুসন্ধানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

দেখা গেছে, সাড়ে তিন দশক ধরে চলে আসা এই জলাবদ্ধতায় নানামুখি সংকট ভুক্তভোগীদেরকে শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ফলে, বিঘ্নিত হচ্ছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা। অনেকে এই পরিবেশে বেঁচে থাকাটাকেই 'আশীর্বাদ' মনে করে অন্য কিছু ভেবে নিজেকে আরও দুর্বল করতে চান না। অধিকাংশ মানুষ জানেনই না বা বোঝেনই না যে মানসিক স্বাস্থ্য আসলে কী। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে গেলে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও যে কম গুরুত্বপূর্ণ না সে বিষয়ে ভুক্তভোগীদের কোনো ধারণাই নেই। আবার যারা এটি উপলব্ধি করছেন মনের সুস্থতায় করণীয় বিষয়ে তাদের গুরুত্ব নেই।

অন্যদিকে, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্যনীতি ২০২২ অনুমোদিত হলেও তা বেশিরভাগ কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এ আইন ও নীতি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়নে খুব বেশি উদ্যোগ নেই। তেমনি মানুষের মধ্যেও এ বিষয়ে তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। এমনকি স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগও এ বিষয়টি নিয়ে

উদাসীন। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি বাস্তবায়নে জলাবদ্ধ এ অঞ্চলের মানুষের জন্য কোনো বিশেষ কর্মসূচি বা উদ্যোগ নেই জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের। নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবেই চলছে সব কার্যক্রম। জলাবদ্ধতার পর এ অঞ্চলের মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কিছু উদ্যোগ নিলেও মানসিক স্বাস্থ্য বরাবরই অবহেলিত।

- ভবদহ এলাকার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে পূর্বের কোনো তথ্য নেই
- অধিকাংশ মানুষ বোঝেনই না মানসিক স্বাস্থ্য কী
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ কম
- ১৭ শতাংশ মানুষ নিজেকে মূল্যহীন মনে করেন
- মানসিক সমস্যার কথা বললে মনে করেন পাগল হয়ে যাচ্ছে

## ‘মানসিক সমস্যা হচ্ছে বললে সকলেই মনে করেন ‘পাগল হয়ে যাচ্ছে’

জরিপে অংশ নেয়া জলাবদ্ধ এলাকার ১৭ শতাংশ মানুষ নিজেকে মূল্যহীন মনে করেন। নিজেকেশেষ করে দেয়ার চিন্তা এসেছে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষের মনে। এমনটি কেন হয় বা গত তিন মাসে মনে হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলের উত্তর এক। তা হলো চলমান পরিস্থিতিতে তাদের পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক অসচ্ছলতা, ক্ষেত্রবিশেষে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে না পারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মশিয়াহাটি এলাকার এক যুবক জানান, ২০০৭ সাল থেকে প্রায় ১৫ বছর পড়ালেখা ও চাকরির প্রস্তুতির জন্য তিনি শহরে কাটিয়েছেন। একাধিক চাকরির ভাইভা দিয়েও চাকরি হয়নি। শেষপর্যন্ত এলাকায় এসে মাছের ব্যবসা শুরু করেন। পরিবারের প্রতি তার কিছু দায়বদ্ধতা আছে, কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারছেন না। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে ব্যবসা শুরু করেছিলেন হঠাৎ বেড়ে যাওয়া পানিতে তার সব শেষ হয়ে গেছে। এত চাপ তিনি নিতে পারেন না। কারো সাথে কষ্ট শেয়ার করলেও তারা গুরুত্ব দেন না। এর মধ্যে দু’দফা মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে চিকিৎসাও নিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘অনেকে বুঝতেই পারেন না যে তিনি মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আমি বুঝি, কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। আর পরিবার পরিজন মনে করছেন কালো জাদুর প্রভাব, তাই ছুটছেন কবিরাজের কাছে।’

চা দোকানি বিনজু ধর বলেন, ‘মনের মধ্যে সর্বদা চিন্তা ঘুরতে থাকলে এমনিতেই দেহে নানা রোগ বাসা বাধে। তবে, সবসময় সকলকে মনের কথা বলাও যায় না।’ অনুভূতি জানাতে গেলে ‘বিড়ম্বনায় পড়তে হয়’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘মানসিক সমস্যা হচ্ছে বললে সকলেই আগে মনে করেন পাগল হয়ে যাচ্ছে।’

মশিয়াহাটি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী রিম্পা মন্ডল, অর্থি বিশ্বাস জানান বিভিন্ন খবরে তারা প্রায়ই

দেখেন নামিদামি তারকারা মানসিক বিষণ্নতায় ভোগেন। এমনটা সাধারণেরও হয়, তবে, এ বিষয়ে খবর রাখে না কেউ। তারা বলেন, 'ভবদহবাসীর বর্তমানে যে অবস্থা এখন জল সরানোর পাশাপাশি জলাবদ্ধ মানুষগুলোর মানসিক প্রশান্তি প্রয়োজন।

## 'ভবদহবাসী মানুষ না উভচর প্রাণী'

জলাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ এবং পানিবাহিত রোগে ভবদহের মানুষ প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করলেও তাদের মানসিক অবস্থায় যে প্রভাব পড়ছে সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক রনজিত বাওয়ালী তাদের দুর্দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন, 'ভবদহবাসী আসলে আর মানুষ নেই। তারা উভচর প্রাণী হয়ে গেছে। জীবনের অনুভূতি থাকলিও মনের অনুভূতি এ এলাকার মানুষের নেই।' 'প্রায় প্রতি বছর মাসের পর মাস এত প্রতিকূলতা আর জলের মধ্যে কোনো মানুষ টিকতে পারে কিনা' প্রশ্ন করে তিনি আরও বলেন, 'যাগের মনই বাঁইচে নেই তাগের আবার কিসির সুস্থতা!'

আসলে আর মানুষ নেই। তারা উভচর প্রাণী হয়ে গেছে। জীবনের অনুভূতি থাকলেও মনের অনুভূতি এ এলাকার মানুষের নেই।' 'প্রায় প্রতি বছর মাসের পর মাস এত প্রতিকূলতা আর জলের মধ্যে কোনো মানুষ টিকতে পারে কিনা' প্রশ্ন করে তিনি আরও বলেন, 'যাগের মনই বাঁইচে নেই তাগের আবার কিসির সুস্থতা!'

জরিপে অংশ নেয়া ভুক্তভোগীরা জানান, চাইলেই একগ্লাস বিশুদ্ধ পানি হাতের কাছে পাওয়া যায় না, স্বাচ্ছন্দের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সুযোগ যেখানে নেই বললেই চলে, সেখানে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আলাদা করে চিন্তা করাটা তাদের কাছে বিলাসিতা। আর চাইলেই তাদের সে সুযোগ বা আর্থিক সঙ্গতি নেই।

## তৃণমূল পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবার হাল

কেশবপুরের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল আহাদ জানান, ফ্রি ওষুধ পাওয়ায় স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকেই যান তারা। তবে, পানির কারণে অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকও খোলার পরিবেশ নেই। আব্দুল আহাদের মতো মণিরামপুর ও অভয়নগরের এক তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে তারা চর্ম রোগের জন্য ওষুধ আনতে যান। নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ পেলেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় নিজেদের সমস্যা বলে তেমন কোনো উপকার হয় না। ভুক্তভোগীরা জানান, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সকল স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া সহজ হলে অর্ধেকের বেশি মানুষই সমস্যা অধিকতর গুরুতর হওয়ার আগে চিকিৎসা নিতে পারতেন।

এ বিষয়ে ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ইকবাল কবির জাহিদ বলেন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে এখনো অবহেলিত মানসিক স্বাস্থ্য। এটা স্পষ্ট যে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চাহিদার বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল খাতের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। গত চার দশক ধরে ভবদহ অঞ্চলের মানুষের জলাবদ্ধতা নিরসনে সব সময় প্রচেষ্টা থাকলেও তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে জানান তিনি।

## মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যত উদ্যোগ তা প্রকল্প ভিত্তিক

যশোরে সরকারি কোনো উদ্যোগ না থাকলেও বেসরকারি পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেছে হাতেগোনা কয়েকটি সংস্থা। এরমধ্যে অন্যতম ইনোভেশন ফর ওয়েলবিয়িং ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএফ) এবং এডিডি ইন্টারন্যাশনাল। আইডব্লিউএফের প্রকল্প শেষ হলেও এডিডি ইন্টারন্যাশনালের কাজ চলমান। তবে, তাদের প্রকল্প এলাকা যশোরের সদর উপজেলা। এডিডি ইন্টারন্যাশনাল যশোর অফিসের ফিল্ড অফিসার পারুল আক্তার জানান, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের আওতায় তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা করেন। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন পেশার ২৭ জন মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইডার তৈরি করেছেন, যারা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাথমিক সেবা বা পরামর্শ দিতে পারবেন। তবে, ভবদহে তাদের কোনো কাজ হয়নি এবং এ অঞ্চলের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে তার কাছে তথ্য নেই। এলাকার মানুষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে এডিডি ইন্টারন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইডার এবং মনোবিদদের নিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ক্যাম্প আয়োজন করবে বলে জানান তিনি।

## যা বলছে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ

যশোরের সিভিল সার্জন ডাক্তার মাহমুদুল হাসান বলেন, শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকেন্দ্র উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে নেই। তবে, উপজেলা স্বাস্থ্য  কেন্দ্রে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন চিকিৎসককে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞরাই উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের রোগীদের প্রাথমিক সেবা দেন। জেলার কোন অঞ্চলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য কী পর্যায়ে আছে বা কোনো অঞ্চলে বিশেষ তত্ত্বাবধান দরকার কিনা এমন কোনো পরিসংখ্যান এখনো সিভিল সার্জন অফিসের কাছে নেই বলেও জানান তিনি। সরকারিভাবে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালেও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হাতেগোণা কয়েকজন বলে তিনি গ্রামের কাগজকে জানান।

## সারাদেশের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ যেমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের তথ্য অনুসারে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন আছে এমন মানুষদের মধ্যে মাত্র আট ভাগ মানুষ সেবা নিতে পারছেন, ৯২ শতাংশই মানসিক স্বাস্থ্য সেবার বাইরে রয়ে যান। অতীতে মোট স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র শূন্য দশমিক ৪৪ ভাগ বরাদ্দ হয় এই খাতে। এছাড়া, বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন মানুষ মানসিক রোগে বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গত পাঁচ বছরে কোনো জরিপ বা গবেষণা নেই। যদিও চলতি বছর থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও স্বাভাবিক হারে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে চিকিৎসা ও ওষুধ মিলবে বলে গত বছর ঘোষণা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

নিউরোসাইকোলজি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডাক্তার এমএম জালাল উদ্দীন বলেন, ‘আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার রোগী সার্বিক স্বাস্থ্য খাতের ১৩-১৪ শতাংশ। অথচ এর বিপরীতে বাজেট মাত্র ০.৫ শতাংশ। সুতরাং আমাদের সম্পদের যেমন ঘাটতি আছে আমাদের বাজেটেরও ঘাটতি আছে’।

সরকারি ডিএনএ ল্যাবের মহাপরিচালক ডাক্তার এ এম পারভেজ রহীমের মতে, উপজেলা লেভেলে মেন্টাল হেলথ সেবা এখনও জিরো পর্যায়ে আছে। ১৮ কোটি মানুষকে সেবা দিতে পাঁচ হাজার প্রশিক্ষিত পেশাজীবী দরকার। হাসপাতালে সাইকোলজিস্টদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে। তড়িৎ গতিতে এই প্রসেস করতে হবে। তা না হলে মেডিকেল এবং নন মেডিকেল প্রফেশনালদের মধ্যে বৈষম্য রয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

শেষ পর্ব

# সমস্যা সমাধানে এখনই পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ

যশোরের ভবদহ এলাকার ভুক্তভোগী মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানে উঠে আসা তথ্যকে উদ্বেগজনক হিসেবে অভিহিত করে এ বিষয়ে এখনই কার্যকর উদ্যোগের পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টরা। তারা মনে করেন, এ বিষয়ে আগেই সংশ্লিষ্টদের গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল। এখন যে অবস্থা তা যাতে আরও খারাপের দিকে না যায় সে কারণে সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারাদেশেই মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতি আছে। তবে, পরিস্থিতি বিবেচনায় ভবদহ এলাকায় এটি অতি জরুরি বলেই এখানে বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদেরকে কাউন্সেলিংসহ সকল প্রকার চিকিৎসাসেবা প্রদান করা দরকার বলে তাদের মত।

'যশোরের দুঃখ' হিসেবে পরিচিত ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতার কবলে থাকা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দৈনিক গ্রামের কাগজের ধারাবাহিক অনুসন্ধান, সাক্ষাৎকারভিত্তিক গবেষণা এবং সকল বয়সী শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে কথা বলে যে পরিস্থিতি উঠে এসেছে তা তুলে ধরা হয় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, এই এলাকায় কাজ করা বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের কাছে। এর ভিত্তিতেই তারা এসব পরামর্শ দিয়েছেন। এসব মানুষের মধ্যে যাদের মতামত এখানে তুলে ধরা হয়েছে তারা হলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন, ইনোভেশন ফর ওয়েলবিয়িং ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএফ) প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মনিরা রহমান, অ্যাকশন অন ডিজএবিলিটি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (এডিডি)'র মেন্টাল হেলথ প্রজেক্টের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল হারুন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম।

তারা বলেছেন, মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে আর্থসামাজিক বিষয়সহ অনেক কিছু যুক্ত আছে। মানসিক স্বাস্থ্য বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব না। ফলে, এটাকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যাবে না। কেউ কেউ আগামী বাজেটে এই বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার সুপারিশও করেছেন। একইসাথে সারা দেশেই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে গবেষণার উপরও গুরুত্বারোপ করেন তারা। বলেন, যত বেশি জরিপ ও গবেষণা হবে তত বেশি মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'যদি কমপক্ষে ছয় মাস ধারাবাহিকভাবে মন খারাপ থাকে সেটাকে আমরা বলবো ডিপ্রেশন। যেহেতু তারা ধারাবাহিক জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত সেহেতু এটি পোস্ট ট্রমাটিক স্টেজ ডিজঅর্ডার নয়, ডিপ্রেশনই। ডিপ্রেশন শুধু এই (ভবদহের জলাবদ্ধ) মানুষ না, সব মানুষের জন্যই খারাপ। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যে একটা পটেনশিয়ালিটি আছে ডিপ্রেশন সেই পটেনশিয়ালিটি ধ্বংস করে দেয়। ডিপ্রেশন সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয়। ডিপ্রেশন থেকে উত্তরণের জন্যে প্রাথমিক কাউন্সেলিং সার্ভিস আছে। এটির জন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়ার দরকার আছে'।

> আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যে একটা পটেনশিয়ালিটি আছে ডিপ্রেশন সেই পপ্টেনশিয়ালিটি ধ্বংস করে দেয়। ডিপ্রেশন সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয়।
>
> আমিনুল ইসলাম, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তিনি বলেন, দেশের চার-পাঁচটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে। এখান থেকে প্রতি বছর প্রায় ছয়-সাতশ' শিক্ষার্থী বের হয় সাইকোসোস্যাল কাউন্সেলিংয়ের উপর। সরকার যদি এসব জায়গায় ফিজিক্যাল হেলথের যে ক্যাম্পেইনগুলো হয় এরকম সাইকোলজিক্যাল এক্সপার্টদের একটা বাজেট দিয়ে মেন্টাল হেলথের জন্য বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করতে পারে তা হবে বিশেষ ফলদায়ক। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ভূমিকা রাখতে পারেন। তবে, সরকারের উদ্যোগ ছাড়া এটি কোনোভাবেই সম্ভব না বলে মনে করেন তিনি।

প্রচলিত ধারণা দিয়ে তিনি বলেন, ডিপ্রেশন, এংজাইটিস ঘুরেফিরে বারবার আসতে পারে। খুবই কমন একটা রোগ। প্রত্যেকটা সুস্থ মানুষই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে ডিপ্রেশন এংজাইটিতে পড়ে। এটিতে পড়ছে বলেই তাকে পাগল বলা যাবে না। সে অলরেডি ডিপ্রেশনে পড়েছে, ফাইট করছে নিজের সাথে নিজে, তার উপর সোসাইটি যদি মানসিক সমস্যা হওয়া মানেই পাগল বলে সম্বোধন করে তাহলে তার কামব্যাক করা অনেক সমস্যা হয়ে যায়।

প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে ইউকে ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যাকশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (এডিডি) ইন্টারন্যাশনাল। এর বাংলাদেশের মেন্টাল হেলথ প্রজেক্টের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল হারুন বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য শুধু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত না, এর সঙ্গে আর্থসামাজিক বিষয়সহ অনেক কিছু যুক্ত আছে। তাই এসব আইন, নীতিমালা ও কৌশলপত্র সঠিকভাবে বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সবার সহযোগিতা দরকার। এ জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। সারাদেশের পাশাপাশি ভবদহের মতো বিশেষ সমস্যাপ্রবণ এলাকায় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। সেজন্য বরাদ্দ ও বরাদ্দের সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কর্তাব্যক্তিরা আগামী জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের বিষয়টি প্রতিফলনের চেষ্টা করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

> মানসিক স্বাস্থ্য শুধু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত না, এর সঙ্গে আর্থসামাজিক বিষয়সহ অনেক কিছু যুক্ত আছে
>
> আব্দুল্লাহ আল হারুন, প্রজেক্ট ম্যানেজার, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

ইনোভেশন ফর ওয়েলবিয়িং ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএফ) এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মনিরা রহমান বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) তিন নম্বর এজেন্ডায় সুস্বাস্থ্য ও

কল্যাণের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বাদ দিয়ে আমরা টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না। এখন পর্যন্ত আমাদের চিকিৎসাসেবা বড় শহরকেন্দ্রিক। মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ করে উপশহর, গ্রামীণ ও দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ জনবল তৈরিতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ জরুরি। জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কেউ যেন মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতার বাইরে না থাকে। বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সেবা দিচ্ছে। তাই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতা আরও বাড়তে পারে। তিনি বলেন, অল্প কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ছাড়া কোথাও মানসিক স্বাস্থ্যের বিভাগ নেই। মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে আলাদা ইউনিট দরকার বলেও মত দেন তিনি।

> মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ করে উপশহর, গ্রামীণ ও দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ
>
> মনিরা রহমান, প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএফ

মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন বলেন, আলাদা আলাদাভাবে এমন করে যত বেশি জরিপ ও গবেষণা হবে তত বেশি মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে। এ বিষয়ে ক্যাম্পেইন করা প্রয়োজন বলে মত দিয়ে তিনি বলেন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করে মানসিক স্বাস্থ্যের কৌশলগত পরিকল্পনায় নজর দেয়া প্রয়োজন।

> স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করে মানসিক স্বাস্থ্যের কৌশলগত পরিকল্পনায় নজর দেয়া প্রয়োজন
>
> হেলাল উদ্দিন, অধ্যাপক, মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

গত ১০ নভেম্বর ভবদহ অঞ্চল পরিদর্শন করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিকেলে যশোর সার্কিট হাউজ সভাকক্ষে স্থানীয় সুধী, শিক্ষক, ভবদহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে এ প্রতিবেদকের সাথে আলাদাভাবে কথা বলেন উপদেষ্টা। এ অঞ্চলের মানুষ নিয়ে গ্রামের কাগজের জরিপের ফলাফলের সারাংশ শুনে তিনি বলেন, ভবদহের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের কাজটা যাতে তারা স্থায়ীভাবে করতে পারেন, সেটাই তাদের (অন্তর্বর্তী সরকারের) উদ্দেশ্য।

> এই মুহূর্তে ভবদহবাসীর মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার একমাত্র উপায় তাদের কথা শোনা এবং তা বাস্তবায়ন করা।
>
> সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ভবদহের জলাবদ্ধ মানুষগুলোর পক্ষে ২০০৫ সালে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, 'ভবদহে জলাবদ্ধতার অবস্থাটা দিন দিন আসলে খারাপ হয়ে গেছে। যেহেতু সমস্যার সমাধান সময়মতো হয়নি, সেহেতু সমস্যাটা আরও বেশি গাঢ় হয়ে গেছে'। তার অংশ হিসেবেই বিষণ্নতা আসতে পারে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'জলাবদ্ধ মানুষগুলো যে অবস্থায় আছেন এটা অকল্পনীয়'। নিজ চোখে দেখা তাদের দুরবস্থার চিত্র তিনি সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে দেবেন বলে জানান।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, এই মুহূর্তে ভবদহবাসীর মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার একমাত্র উপায় তাদের কথা শোনা এবং তা বাস্তবায়ন করা। সেই অনুসারেই কাজ হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে যদি এ অঞ্চলের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যে বিশেষ বিরূপ প্রভাব পড়ে গুরুত্ব বিবেচনায় প্রয়োজনীয় গবেষণা ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নেবে। তবে, এখন যা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হলো 'পাঁচ লাখ মানুষের ভোগান্তির সমাধান আগে করা, অর্থাৎ বসতবাড়ি, ফসলের ক্ষেতে জমে থাকা পানি অপসারণ করা'।

# অনুসন্ধানী রিপোর্টসমূহ প্রকাশ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার উপর সম্পাদকদের লেখা

**আর এম কবিরুল আলম দীপু**
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক রানার

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দৈনিক রানার পত্রিকায় 'জেলেরা পান না জলের অধিকার' শীর্ষক বাঁওড়ের দখলদারিত্ব-জেলে জনজীবনের বঞ্চনার ঘটনাবলিকে সাক্ষ্য হিসেবে ধরে দীর্ঘদিন চলমান বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলন কর্মসূচি আমরা এগিয়ে নিতে অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগানোর কাজ করেছি বলে মনে করি। বাঁওড় মালিকানা নিশ্চিতের লড়াইয়ে ইজারা বাতিল, দখলমুক্ত ও রাষ্ট্রীয় সমন্বয়ে সমবায় উদ্যোগ গ্রহণে জেলেদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জলমহাল নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি। প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই রানার কার্যালয়ে এসে সাধুবাদ জানিয়ে একথা বলেন, বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলন কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব সুজন বিপ্লব।

জেলেদের জীবনচিত্র ও সরকারি বাঁওড় ব্যবস্থাপনা নিয়ে দৈনিক রানারে যে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে সেটি সত্যি অসাধারণ। কারণ ইতিপূর্বে কেউ কখনো জেলেদের নিয়ে পত্রিকার পাতায় লেখেনি। তাছাড়া দৈনিক রানারে প্রকাশিত পাঁচ পর্বের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বাস্তবায়ন করলে বিলুপ্তপ্রায় এই সম্প্রদায়টি টিকে থাকবে বলে আমি মনে করি - বলেন ওয়াজেদ খান ডাবলু, সাবেক প্যানেল মেয়র, কেশবপুর পৌরসভা, যশোর।

বাংলাদেশের জেলেরা বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সরকারি বাঁওড় কেন্দ্রিক জেলেরা দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। বিশেষ করে সরকারি ইজারা প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে জেলেদের একটি বড় অংশ বঞ্চিত হয়ে অবহেলিত থাকে। বাধ্য হয়ে এরা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। ফলে এই সম্প্রদায়টি বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম। দৈনিক রানার সম্প্রতি পাঁচ পর্বে জেলেদের জীবনযাত্রা নিয়ে ধারাবাহিক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তা সত্যি অসাধারণ। জেলেদের জীবনের বর্তমান হালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। আমি মনে করি- সরকারি বাঁওড়গুলোর ইজারা প্রথা বাতিল করে অথবা সব জেলেকে অন্তর্ভুক্ত করে বাঁওড়ে মাছ চাষের সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহলে জেলেরা বেঁচে থাকতে পারবে - বলেন শহিদুল ইসলাম মিলন, বিশিষ্ট ঘের ব্যবসায়ী ও সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য, যশোর জেলা পরিষদ।

আমি একজন শিক্ষক ও একজন নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠক। সম্প্রতি দৈনিক রানার পত্রিকায় কয়েক পর্বে জেলেদের নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। আমার বাসা যশোরের মণিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা বাঁওড়ের পাশে। ফলে এখানকার জেলেদের জীবনযাত্রা আমি স্বচক্ষে দেখি নিয়মিত। দৈনিক রানার পত্রিকায় জেলেদের নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ

প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো কোন পত্রিকায় আমি দেখিনি। জেলেদের নিয়ে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনের মতো আমিও মনে করি সরকারি বাঁওড়গুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। তাহলে জেলে সম্প্রদায়টি টিকে থাকবে এবং তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে -মন্তব্য করেন রবিউল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মণিরামপুর, যশোর।

প্রবীণ শিক্ষক তারাপদ দাস, সাংবাদিক দেবু মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ রায়, সালমান হাসান রাজিবসহ অনেকেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে এমন প্রতিবেদন করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

**মবিনুল ইসলাম মবিন**
সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক গ্রামের কাগজ

## সমন্বিত কর্মসূচির সফলতার গল্প

'যশোর জেলায় সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠান (সিএসও) ও গণমাধ্যমের যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এখানকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও অধিকার আদায়ে তাদের কণ্ঠস্বর জোরদারকরণ' প্রকল্পের আওতায় যৌথভাবে কাজ করেছে দৈনিক গ্রামের কাগজ ও সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (সাকমিড)। ২০২৪ এর জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের সমন্বিত পথচলায় প্রাপ্তি ও সফলতার দিক রয়েছে অনেক। পারস্পরিক সহযোগী এ প্রতিষ্ঠান দুটির বাইরে এ প্রাপ্তি ও সফলতার সাথে সম্পৃক্ত আছেন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রায় প্রত্যেকে।

### সম্পর্ক উন্নয়ন

এক বছরের এ কার্যক্রমে সাকমিড ও গ্রামের কাগজের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। যশোরের সাতটি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের কাজে বেশি যোগাযোগ রক্ষা করেছে গ্রামের কাগজ। আর এ কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে। জনস্বার্থ মূলক যে কোনো গবেষণা থেকে শুরু করে অধিকার সংরক্ষণ এবং জনসচেতনতায় পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যম বান্ধব হয়ে উঠেছেন। এক বছরের কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনা ও ফেলোশিপ কার্যক্রমে স্থানীয় পত্রিকার দেড়শতাধিক সংবাদ কর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকায় মিডিয়া হাউজের কর্মীদের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পত্রিকাগুলোর গেটকিপার বা মালিক পক্ষ ও অন্য কর্মীদের মধ্যকার অনেক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি সম্ভাবনার পথও উন্মোচিত হয়েছে।

একই সাথে স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন, নারী সংগঠন, নারী উদ্যোক্তা ও নেতৃস্থানীয় নারীদের কর্মকাণ্ডের সাথে চমৎকার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রামের কাগজ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

## সাংবাদিকতায় সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

গ্রামের কাগজ ও সাকমিডের সমন্বিত এ কর্মসূচির অন্যতম একটি বিশেষ অংশ ছিল সাংবাদিকদের জন্য ফেলোশিপের সুযোগ। তবে তার আগে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের নিয়ে আলাদা চারটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এগুলো ছিল অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ফ্যাক্টচেকিং, ডাটা জার্নালিজম এবং সাংবাদিকতায় অ্যাডভোকেসি। বিষয়গুলো এ অঞ্চলের সংবাদকর্মীদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা জানান, এ প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত জীবনে বিশেষ সহায়ক হবে এবং সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক সাংবাদিকতায় ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় ১৫ জন সাংবাদিকের মধ্যে নতুন এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ এ কর্মসূচির অন্যতম বিশেষ প্রাপ্তি মনে করে গ্রামের কাগজ ।

## আগামী পথচলা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা

প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে শুরুতেই গ্রামের কাগজ এবং সাকমিড যৌথ উদ্যোগে নিজেদের সামর্থ্য-দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের পাশাপাশি চাহিদা ও সক্ষমতা মূল্যায়নে দায়িত্বশীল কর্মীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করে। এ উদ্যোগটি ছিল গ্রামের কাগজের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এটি শুধু প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্যই নয়, পত্রিকার মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে আরও কি কি প্রয়োজন তার দিশা দেয়। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকেও খুঁজে আনতে সহযোগিতা করে। পাশাপাশি নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে এ আয়োজন। 'সিএসও গণমাধ্যম সহযোগ: অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষক' মতবিনিময় ছিল আরেকটি ফলপ্রসূ উদ্যোগ। এ আয়োজনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কাছে সিএসও -এর চাওয়া বা প্রত্যাশা কি এবং তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় আরও কীভাবে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে। এ উদ্যোগ থেকে বেরিয়ে আসা কর্মপন্থা ও তথ্য আগামীতেও সর্বদা সহায়তা করবে।

## পাঠক, দর্শকের আস্থা বৃদ্ধি

গণমাধ্যমের প্রাণ শক্তি হচ্ছে পাঠক বা দর্শক। তাদের ইতিবাচক মনোভাব আস্থা বিশ্বাস অটুট থাকাটা যেকোনো মিডিয়া হাউজের জন্য বিশেষ পাওয়া। গ্রামের কাগজ ও সাকমিডের সমন্বিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে পত্রিকাটির। কারণ গ্রামের কাগজের সাংবাদিকদের পাওয়া ফেলোশিপের আওতায় বিশেষ অনুসন্ধানী চারটি বিষয়ে ১৭ টি আলাদা নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয় এবং সংবাদই ছিল জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, নারী এবং দুর্নীতির শিকার মানুষ এ সংবাদে নিজেদের মনের কথা খুঁজে পাওয়ায় গ্রামের কাগজের প্রতি তাদের আস্থা আরো বেড়েছে যা পত্রিকাটির পাঠক ফোরামের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ বিশেষ প্রতিবেদনগুলো নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি অন্য মিডিয়া হাউজগুলোর সাংবাদিকদেরও এমন সংবাদ তৈরিতে আগ্রহ বেড়েছে।

## ফ্যাক্টচেক কর্ণারের যাত্রা

সমন্বিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের কাগজের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অনলাইনে ফ্যাক্টচেক কর্ণারের যাত্রা। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। গুজব, অপতথ্য, কু তথ্য যাচাইবাছাই করে গ্রামের কাগজের ফ্যাক্টচেক টিম সংবাদ পরিবেশন করছে। এই টিম তাদের সাধ্যমতো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আলোচিত বিষয় যেগুলোর ফ্যাক্টচেক প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়। পাঠকদের কাছেও ফ্যাক্টচেক কর্ণারের কার্যক্রম প্রশংসিত হচ্ছে। গ্রামের কাগজের ডিজিটাল প্লাটফর্মসহ ফ্যাক্টচেক টিমের কাছে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভিডিও ও পোস্ট সরবরাহ করেন আগ্রহীরা। অনলাইনের পাশাপাশি ফ্যাক্টচেকের বিষয়টি প্রিন্টেও ছাপা হয় গ্রামের কাগজে। তবে এব্যপারে টিমের জন্যে প্রয়োজনীয় আরো প্রশিক্ষণ দরকার বলে মনে করছে গ্রামের কাগজ কর্তৃপক্ষ।

## শেষকথা

দেশের দক্ষিণ পশ্চিম জনপদের পাঠকপ্রিয় পত্রিকা গ্রামের কাগজ সবসময়ই নতুনের পথে চলে। একদিকে দেশ, সমাজ, মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, অন্যদিকে সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে গ্রামের কাগজের নানামুখী উদ্যোগ পাঠকদের কাছে অনন্য মাত্রা সৃষ্টি করেছে। অতীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে গ্রামের কাগজ টিমের যে অভিজ্ঞতা ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সাকমিডের সাথে সম্পৃক্ততায় তা এগিয়েছে আরো একধাপ। তবে একটি কথা না বললেই নয়, কর্মসময় অর্থাৎ প্রকল্প মেয়াদ স্বল্প থাকায় নানা পরিকল্পনা শতভাগ সম্পন্ন করা কষ্টকর হয়েছে। মিডিয়া-সিএসওর একসাথে এমন ফলপ্রসূ ও চমৎকার কাজ টেকসইয়ের জন্য প্রকল্প চলমান থাকা গুরুত্বপূর্ণ। দরকার দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। আগামীর জন্য এমন প্রত্যাশা দৈনিক গ্রামের কাগজের।

# প্রতিবেদনের বাছাই ছবি

নাড়ুর অডার নেয়া হচ্ছে
Joyoti Society- জয়তী সোসাইটি
4d ·
১. টাটকা নাড়ু - ৪০ টাকা
২. গুড়ের নাড়ু - ২৫ টাকা
৩. চিনির নাড়ু - ২৫ টাকা... See more

Faria's pastry shop
24 Nov ·

# যশোর জেলার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কাজের অঞ্চলসমূহ

## সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট

সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (সাকমিড), একটি গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা। বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গণমাধ্যমের উন্নয়নে এ সংস্থা কাজ করে চলছে। বাংলাদেশকে তার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণেও সংস্থাটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সাকমিড ২০১৭ সালের ২২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর বিদেশী অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিবন্ধন আইন ২০১৬, বিধানের অধীনে নিবন্ধিত, যার নিবন্ধন নম্বর : ৩২৫৫।

### ঠিকানা

বাড়ি: ৪/২, ৩য় তলা, ইকবাল রোড, ব্লক: এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৯০১, +৮৮ ০২ ৪১০২২৯০২, +৮৮ ০১৮১৯১২৯৪৭৩
info@sacmid.asia | dd.sacmid@gmail.com
www.sacmid.asia